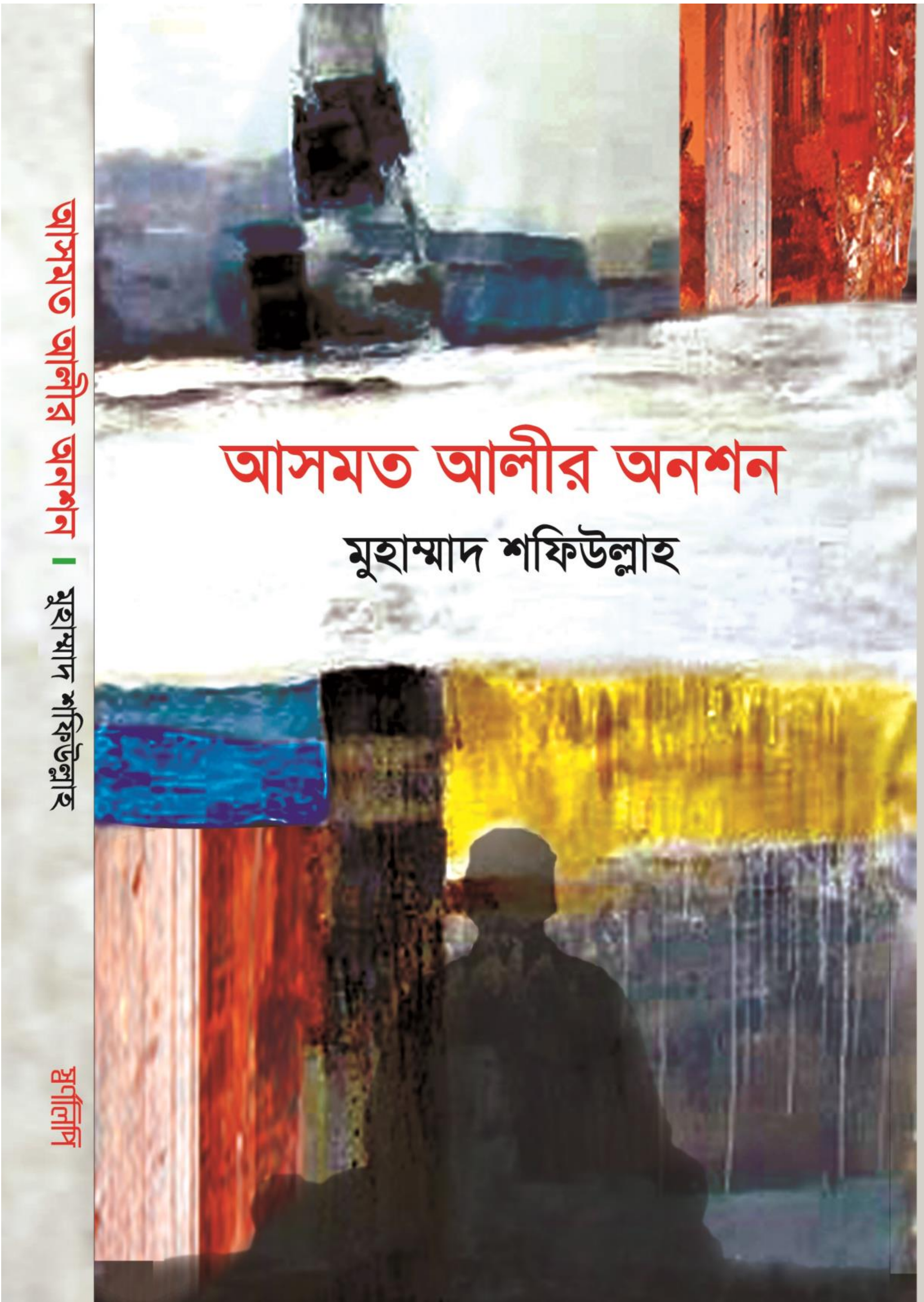
আসমত আলীর অনশন
মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ

আলোকচিত্রী : ফজলে শাহরিয়ার

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহর জন্ম ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর। বাংলাদেশের ২২তম বিজয়ের উজ্জ্বল আলোয়। বাবা মুহাম্মাদ সিরাজুল হক ও মা মোমেনা বেগমের সাত ছেলের মধ্যে সব থেকে ছোট তিনি। পিতৃপুরুষের নিবাস বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জ থানার চিংড়াখালিতে হলেও লেখকের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছোট্ট মায়াবী মফস্বল পিরোজপুরে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে কালীগঙ্গা, সন্ধ্যা, কঁচা ও বলেশ্বরের ঢেউয়ের কোমল স্নেহে। পিরোজপুর টাউন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং পিরোজপুর সরকারি সোহ্‌রাওয়ার্দি কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রকৃতির সান্নিধ্য নিয়ে লেখালেখি করছেন ১৪ বছর বয়স থেকে।

বর্তমানে তিনি নৃ-বিজ্ঞানে বিএসএস (স্নাতক) শেষ করে এমএসএস (স্নাতকোত্তর) এ অধ্যয়ন করছেন। অধ্যয়নের পাশাপাশি ২০১৩ থেকে প্রথম সারির বেশ কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে একটি দৈনিকে সাংবাদিকতা করছেন। কলাম লিখছেন বিভিন্ন দৈনিকে। তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির অর্থ-সম্পাদক (২০১৪-২০১৫) ও সাধারণ সম্পাদকের (২০১৬) দায়িত্ব পালন করেছেন। কুমিল্লা ইউনির্ভাসিটি ডিবেটিং সোসাইটির হয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করছেন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্লাটুনের একজন চৌকস ক্যাডেট তিনি। আসমত আলীর অনশন তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ।

চলার পথে কতো কিছুই তো চোখে পড়ে। পদচিহ্ন পড়ে নানা জায়গায়। খুলতে হয় জীবনের নতুন খাতা। এর মধ্যে অনেক কিছুই দেখি, অনুভব করি। জীবন যেন অজানা কোনো রহস্য। প্রতিনিয়তই রূপ বদলায় আপন মহিমায়। যেখানে রূপ তার বদলে যাওয়ার স্বভাবগত অভ্যাস নিয়ে ব্যক্তির সাথে দ্বন্দ্ব করে। এ দ্বন্দ্ব কখনো কখনো ঝরায় চোখের পানি। মনে হয় মৃত্তিকার উর্বরতার জন্যই প্রয়োজন এ পানির! পথ চলতে চলতে ক্লান্ত পথিকের চোখে ধরা পরে জীবনের রূপ। যেখানে সব অচেনা ও নতুনের মাঝে পথিক শুধু আগন্তুক হয়ে নিজের জায়গাটুকুই দখল করে। মুহাম্মাদ শফিউল্লাহর *আসমত আলীর অনশন* নিছক এক গল্পগ্রন্থ নয়। এর মাঝে রয়েছে বাস্তবতায় মোড়ানো শ্রেণি বৈষম্য, প্রেম-বিরহ, অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী। গল্পগুলোর প্রতিটি চরিত্রের সাথে লেখকের বন্ধন আজন্মের। মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ তাঁর স্বভাবসুলভ সারল্য দিয়ে আমাদের শোনাবেন সেই জীবনেরই গল্প। যে গল্প আমার, আমাদের।

প্রচ্ছদ
জাবেদ ইমন

আসমত আলীর অনশন

মুহাম্মাদ শফিউল্লাহ (গল্পগ্রন্থ)

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৭

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
জাবেদ ইমন

প্রকাশনায়
স্বর্ণলিপি প্রকাশন
১৯৪ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
এয়ারফোন: ০১৭৩২২৯৪০৮৫, ০১৭২২৩৪৮৬৪২, ০১৯৬৫০০৪৯৫৮
ই-মেইল: swornolipiprokashon@gmail.com, khelal292@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস: ইমন কম্পিউটার, ১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

পরিবেশক: মুক্তদেশ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৩৪৬/০১৬৭৫৪১৭৫৬৪

মুদ্রণ: আল ফয়সাল প্রেস,
৩৪, শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

ISBN: 978-984-9264-79-1

Asmot Alir Onoshon by Muhammad Shafiullah Published in Bangladesh by Swornolipi Prokashon, 194 Fakirapul, Motijheel. Dhaka-1000. Date of Publication: February, 2017, Price: Tk. 150.00, U.S.A. 5. Only.

উৎসর্গ

বিশ্বমাধুরী প্রেমললনা প্রিয়তমা 'আত্রলিতা'র হাতছানির অপেক্ষায়।

গল্পধারা	পৃষ্ঠা
স্নেহের প্রতিবচন	৬
শূন্য অভিসার	৯
গতরাত	১৪
কুয়াশায় ঢাকা	১৮
আসমত আলীর অনশন	২৪
ভালোবাসার লাল জামা	২৭
সততার অলঙ্কার	৩০
উঠোনে ঘোলা পানি জমেছে	৩৫
পিছুটান	৩৮
ভাসমান ভাষা সৈনিক	৪১
নুহাশে হুমায়ূনের সাথে	৪৩
সেমাই	৪৭
শেষ চিঠি	৪৯
অপেক্ষা	৫৫

স্নেহের প্রতিবচন

বামপাশের চাকাটি বার বার দোল খাচ্ছে। সাদিক ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের ঐ চাকাটির দিকে তাকাল। নাহ, চাকাটির অবস্থা ভাল ঠেকছে না। কিছুক্ষন পর সাদিক একটা শব্দ পেল। মনে হয় চাকাটা ফুটেছে। ও তিন চাকাওয়ালা রিকসা নামক যান থেকে নামল। চাকাটি ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে একটা ছাতাওয়ালা পিন বের করল। পিনটি হাতের তালুতে রেখে বলল, ‘দিলি তো মোর ঘন্টা দুই সময় নষ্ট কইরা। না, আইজ বুঝি দিনডা আর ভাল গেল না।’

ও রিকসাটাকে টেনে একটা গ্যারেজে নিয়ে গেল। দুপুর এগারোটা তখন। আশ্বিন মাস, সূর্যের তাপ সহ্যের বাইরে। সাদিকের গায়ে ঘাম ছুটছে। কপাল থেকে ঘাম মুছতে মুছতে আকাশের দিকে তাকাল ও। গ্যারেজে তপ্ত টিনের চালের নিচে মিস্ত্রিকে চাকাটা সারাতে বলল, ‘মিয়া দেহ দেহি। চাক্কাডা আমার কফালডারে খারাপ কইরা দেছে।’

‘ঠিক আছে, দেকতাছি। তুমি এহন জিরাও।’

দুপুরে বাড়িতে খেতে গেল না সাদিক। এক প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে একটু দূরেই যেতে হয়েছিল। দুটো কলা, একটা রুটি আর এক কাপ চা ছিল ওর দুপুরের আহার। বাড়ি যেতে রাত নয়টা বাজল। ওর স্ত্রী পারভীন অপেক্ষায় ছিল। সাদিক ঘরে ঢুকতেই তার জিজ্ঞাসা, ‘দুহারে আইলেন না যে?’

‘এটটা খ্যাপ লইয়া দূরে গেছিলাম। আইজগো কামাই ভাল অয় নাই, বউ।’

‘যা অইছে, হেতেই মোগো অবে আনে। আল্লায় আছে না।’

সাদিক সবে মাত্র খেয়ে-দেয়ে উঠল। পারভীন ওকে লক্ষ্য করে বলল, ‘এটটা কতা কইতে ভুইলা গেছি। হোনেন, আইজ শাকিলের চিডি আইছে। টাহা চাইছে ও।’

‘হ মাস তো পাইল, টাহা তো পাডান লাগবে। কিন্তু এহোন তো আতে কোন টাহা নাই। কি করমু কও দেহি।’

‘আরে চিন্তা কইরেন না। আল্লায় এটটা ব্যবস্থা কইরা দেবে। এহোন ঘুমাইতে যান।’

সব কিছু চলবে এই ভরসায় দিন কাটে। সংসারের খরচ চালিয়ে শাকিলকে টাকা পাঠানো আর যায় না। কিন্তু পাঠানো বন্ধ করা যাবে না কিছুতেই। বছরের পর বছর সংসারের ঘানির সাথে চিন্তার ঘানিও টানছে সাদিক। এক টানা খেটেই যাচ্ছে। সুখের দেখা পাওয়া যাবে, এতটুকু সান্ত্বনা। সাদিকের কাছে সুখ মানে সাত আসমানের উপরে শৈল্পিক ভাবনা ছাড়া কিছুই নয়। সুখ নামক সাত রাজার ধন এ জগতে পাওয়া যাবে না বলেই জানে ও। দিন ঘুরে রাত আসে, জোছনাও ঝেকে বসে রাতে, দিনের মাহাত্ম সূর্যের শক্তিতে বাড়ে। তেমনি দুঃখকে সাথে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর মত বয়ে চলে ওদের সংসার। বছরের পর বছর ধরে চলছে এমন। রোজগার যা হয় তাতে দুই জনের তিন বেলা ভাত জোটে কোনমতে কিন্তু স্বাদ-আহলাদ মেটাতে সাহস করাটাই যেখানে মস্ত বড় দুঃসাহস।

সাদিক আর শাকিল দুই ভাই। সাদিক শাকিলের তের বছরের বড়। ওদের কাছাকাছি আপন বলতে কেউ নাই। প্রায় উনিশ বছর আগে বাবা-মা মারা গেছেন। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর অতিকষ্টে দ্বিনাতিপাত করত ওরা। ওদের বাবা ছিলেন একজন বর্গা চাষি। নিজের জমি-জমা এত কম যে সেখানে মাসখানেকের বেশি খোরাকি হতো না। বাবা মারা যাওয়ার এক বছর পর ওদের মা মারা যান। মারা যাওয়ার দিন কয়েক আগে তিনি সাদিককে কাছে ডেকে বলেছিলেন শেষ কথা। তারপর আর মায়ের সাথে কথা হয়নি ওর। মা মারা যাওয়ার সময় শাকিলের বয়স তিন বছর। সাদিকের বয়স ষোল মাত্র। প্রথম দিকে সাদিক বাবার মতই বর্গাচাষ করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক বছরের বেশি চাষ করতে পারল না। দুই বছরের মত শ্রমিকের কাজ করেছে সাদিক। সাদিক চাইত শাকিলকে ভাল একটা স্কুলে পড়াতে। এ জন্য ও গ্রাম থেকে পাশের মফস্বলে আসল। শাকিলকে ভাল একটা কে.জি. স্কুলে ভর্তি করল। এর বছর চারেক পরে ওদের মতই একটা দুখি মেয়ে পারভীনকে বিয়ে করে সাদিক। পারভীন আর শাকিলকে নিয়ে সাদিকের ছোট্ট সংসার। সাদিক জীবনের সকল সুখ পারভীন আর শাকিলকে দিতে চায়। পারভীন শাকিলকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করে। সাদিকের তের বছর সংসার জীবনে ওদের কোন সন্তান নেই। সন্তানের জন্য ওদের কোন আকাঙ্খাও নেই। ওরা বাঁচতে চায় শাকিলকে ঘিরে। শাকিল এখন ঢাকায় সরকারি বাংলা কলেজে এম. এ. পড়ছে।

সাদিক রিকসার প্যাডেল ঘুরাচ্ছে। ও ভাড়ার জন্য যাচ্ছে, সকাল দশটা অবধি মাত্র একটা ভাড়া পেয়েছে। এবার ঈদে শাকিল আর পারভীনকে কিছু কাপড় দিতে চায় সাদিক। পারভীনকে বছরে দুইটা কাপড়ের বেশি দিতে পারে না। এ জন্য পারভীনের কোন অভিযোগও নেই। পারভীন বলে, ও সুখে আছে এ সংসারে। এর চেয়ে বেশি ভালবাসা আর সুখ যে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে ও একজন প্যাসেঞ্জার রিকসায় তুলল। পথিমধ্যে এক অফিসের সামনে সাদিককে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটা। প্রায় তিরিশ মিনিট পর বেরিয়ে এসে আবার রিকসায় চলল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। রিকসা থেকে নামার পর নির্ধারিত ভাড়া দিল লোকটা। সাদিক একটু বেশি ভাড়া দাবি করল, 'আর পাঁচটা টাহা বেশি দেন ছার।'

'কেন বেশি চাচ্ছ?'

'ছার আমনে অফিসে ছেলেন ম্যালা সময়।'

'তো কি হয়েছে। আমি তোমাকে নির্ধারিত ভাড়াই দিয়েছি। আর দিতে পারব না।'

'কিন্তু ছার সবাই যদি আমনের মত কিপটামি করে হেলে তো আমরা...।'

'কৃপণ মানে, কি বললি তুই' এই বলে সেই সাহেব সাদিকের গালে এক চড় বসিয়ে দিল। সাদিক রাগে ক্ষোভে ওখান থেকে রিকসা নিয়ে চলে এলো। ও ভাবল মাত্র পাঁচ টাকার জন্য মারল লোকটা। ও তো শাকিলের বয়সের একটা লোক। শাকিলও কি এ রকম ব্যবহার করে?

আজ দুই বছর হলো শাকিলের সাথে দেখা নেই সাদিকের। কোন চিঠি আসে না শাকিলের কাছ থেকে। ফোনেও যোগাযোগ নাই। বহু খোঁজ খবরের পর সাদিক জানতে পারল যে, শাকিলের পুলিশের চাকরি হয়েছে। পুলিশের এস আই হয়েছে শাকিল। সাদিক পারভীনের সাথে দুঃখ করে বলে, 'এটটা খবর পর্যন্ত দিল না শাকিল। ও কি মোর ওপর রাগ অইছে।'

'আমনে কোন চিন্তা লইয়েন না। ও ঠিকই আইবে। হয়ত কামের খুব চাপ।'

এর মাস খানেক পর সাদিক জানতে পারল, পাশের থানায় জয়েন করেছে শাকিল। সাদিক নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ও চলে গেল শাকিলের কর্মস্থলে। এসে ঢুকলো শাকিলের অফিস কক্ষে। ওখানে শাকিল দু জন লোকের সাথে কথা বলছে। সাদিক শাকিলকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তুই আমারে একটা খবর পর্যন্ত দিলি না। ওদিকে তোর ভাবি কানতে আছে।' শাকিল সাদিকের কথায় বিব্রত হল। ঐ রকম অবস্থায় সাদিক কথা বললে শাকিল বিপাকে পড়ল। শাকিল সামনে বসা লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বসুন আপনারা। আমি একটু আসছি।' শাকিল সাদিককে হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে এলো।

'তুমি এখানে এসেছ কেন?'

'কি কইতাসছ, আমু না? তোরে কত দিন দেহি না'

'ঠিক আছে তুমি যাও আমি একটু ব্যস্ত আছি।'

'তোর ভাবি তোরে যাইতে কইছে। যাবি না?'

'দাদা দেখ আমার আর যাওয়া হবে না।'

'ক্য যাওয়া অবে না ক্য?'

'এখন আমি বিয়ে করেছি। আমার আলাদা সংসার হয়েছে।

'তুই বিয়া হরসছ! আমারে জানাস নাই এট-টু-ও।'

'দেখ দাদা। এখন আর আমার অবস্থানের সাথে তোমার অবস্থান যায় না। তুমি যাও আমার কাজ আছে।' এই বলে শাকিল চলে গেল ওখান থেকে। সাদিকের মনে হলো কে যেন ওর কলিজাটা ছিড়েঁ ফেলেছে। ও নির্বাক হয়ে বাড়িতে এলো। সাদিককে আসতে দেখে পারভীন এগিয়ে এলো। উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'শাকিলের লগে দেহা অইছে?'

'শাকিল যে মোগ ভাই এ কতা ভুইলা যাও বউ।'

'ক্য ভুইলা যামু! ও যে মোগো প্রাণ।'

'ও আর আমাগো নাই। ও আর এক শাকিল অইছে। থানার দারগা অইছে। বিয়া হরছে ও।'

'শাকিল বিয়া হরছে?' অবিশ্বাসের চোখে তাকালো পারভীন।

'ও কইছে মুই আর যেন ওর লগে দেহা না হরি। এত কষ্টের পর ওরে আমি এই মানুষ বানাইছি বউ।' পারভীন সাদিককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মুই যামু শাকিলের লগে দেহা হরতে।'

'না বউ। যাইয়া লাভ নাই। ও তোমারে চিনবে না।'

'বউ লও মোরা বাড়ি যাই এহানে থাইকা আর কি লাভ, কও?'

'বাড়ি যামু, বাড়ি যাইয়া কি হরবেন?'

'বাপের পোতায় একটা ছোট্ট ঘর বানামু। বদলা দিয় যা টাহা পামু হেতে মোগো দুই জনের ভাল কইরা অইয়া যাবে। অবে না বউ?'
'আমনে মোরে যেতায় লইয়া যাবেন, হেতায় যামু। যা দেবেন হেতেই মোর অবে।'
'বাড়ি থুইয়া শহরে আইছি বউ। খালি ইচ্ছা আছিল শাকিলরে মানুষ বানামু। ওরে আইজ সত্যিই বড় মানুষ বানাছি। ও আমার ভালবাসা ফেরত দিছে।'
'থাউক আমনের কাম আমনে হরছেন। আর কি হরার আছে। কাইলই আমরা বাড়ি যামু।'
'না দিনের হলোকে যামু না। রাইতে যামু। কেউ জানবে না। কেউ কিছু কইতে পারবে না। চোরের মত যামু এহান দিয়া।' সাদিক কাঁদতে লাগল।

সাদিক রিকসা চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। রিকসার পেসেঞ্জারের সিটে পারভীন। রাতের বেলা, অনেক রাত, নিস্তব্ধ চারপাশ। জনশূন্য রাস্তাঘাট। সাদিকের মনে হল চারপাশের গাছপালা, রাস্তাঘাট ওকে ধিক্কার জানাচ্ছে। কি জন্য এসেছিল ও এ শহরে। শুধু শাকিলের জন্য পনের বছর এই শহরে অক্লান্ত পরিশ্রাম করেছে যার প্রতিদান ও আজ পেয়েছে। রাতের এ শহরটা যেন লজ্জার চাদরে ঢেকে আছে।
দূরের মোড়ে সাদিক একটা পুলিশের গাড়ি দেখতে পেল। কাছে আসতেই ওর রিকসা থামাল একজন পুলিশ সদস্য।
'এত রাতে কই যাও?'
'কলাখালি যামু।'
'রিকসায় আর কে?'
'আমার বউ।'
'কাগজপত্র আছে তো?' পুলিশ সদস্য জিজ্ঞাসা করল।
'না, নাই ছার।"
'দেও তিন শ টাকা দেও।'
আর একজন পুলিশ সদস্য এগিয়ে এলে আগের জন পাশে সরে দাঁড়াল। জিদ নিয়ে উচ্চস্বরে সাদিক বলল, 'ক্য টাহা দিমু, দিমু না।' টাকা দিতে অসম্মত হয়ে উচ্চ-বাচ্য করায় সাদিকের গালে একটা চড় কষিয়ে পরে আসা পুলিশ সদস্য হুংকার দিয়ে বলল 'শুয়ারের বাচ্চা, টাকা দিবি না মানে।'
শাকিলের কণ্ঠস্বর শুনে সাদিক মাথা তুলে তাকাল। সাদিককে দেখে শাকিল হতভম্ব হয়ে গেল। শুধু পারভীন রিকসার ছাউনির ভিতর থেকে মুখ বের করে বলল, 'ক্যাডা, শাকিল না?'

সকাল বেলা। ১০ মাঘ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
৩৯৭ কবি আহসান হাবীব সড়ক, পিরোজপুর।

শূন্য অভিসার

বেশ লম্বা পথের জলরাশি অতিক্রম করে পাড়ের মাটিতে নৌকার ধাক্কায় খেয়াল হলো আনিসের। ও চলে এসেছে আপন নীড়ে। বছরে দুই একবার বাড়িতে আসার সুযোগ হয় ওর। ঢাকা থেকে সোজা পিরোজপুর, তারপর নৌকায় নিজ গ্রামে আসে। ঘাটে নৌকা থেকে নেমে শত বছরের মাটির রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছে ও। বছর দুয়েক হলো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে চাকরি করছে আনিস। এ গ্রাম ওর কাছে স্বর্গের মত। সুযোগ পেলেই চলে আসে মায়ের কোলে। গ্রামের আলিঙ্গনে। কত যে দিন চলে গেল জীবন থেকে, কত স্মৃতি। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঘরের দরজায় কড়া নাড়লো আনিস।

দুপুরে খেয়ে দেয়ে বিছানায় একটু গড়াগড়ি করলো। এক রাত ও দিনের অর্ধেক সময় পথে পথে কাটিয়েও যেন ক্লান্তি নেই ওর। ঘুমানো চেষ্টা করলো তবে ঘুমের দেখা নেই। মন পড়ে রইল স্কুলের মাঠে। কখন বের হবে। কখন দেখা হবে বন্ধুদের সাথে। দুপুর গড়িয়ে বিকালের কাছাকাছি হলেই নেমে পড়ল ও। আগে যাবে বাজারের দিকে। বন্ধুরা কে, কোথায় আছে। বের হলেই দেখা হবে। সঙ্গে ওর ফুঁফাতো ভাই। আনিস বাড়িতে আসলে ও চলে আসে। চলতে চলতে কত কথা ওদের। কথা যেন শেষই হয় না।

'ভাই তুমি বিয়ে করছো কবে?'

এনামুলের এ প্রশ্নে তির্যক চোখে তাকালো আনিস, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন, তোর মাথায় কি সব কাজ করে!'

'আরে ভাই লজ্জা পাচ্ছো কেন? যাক তোমারও লজ্জা আছে তাহলে? আমি মনে করছিলাম, তোমার লজ্জা-টজ্জা নাই।'

'আরে ধুর। তুই বিয়ে করবি না। করছিস কবে? আছে নাকি কেউ? হুম হুম।'

এনামুল হেসে বলল, 'তুমি তো বেশ টেকনিকবাজ।'

'এখানে টেকনিকের কি দেখলি?'

'বিয়ের কথা আমি জিজ্ঞাস করলাম আর উত্তর না দিয়ে উল্টো আমাকে জিজ্ঞাস করছো?'

'ইঞ্জিনিয়ার বলে কথা।'

বলেই দুজনে হো হো করে হেসে উঠলো। কথা বলতে বলতে ওরা চলে এলো ওদের গন্তব্যে। মাঠের সবুজ কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের বারান্দায় এসে বসলো দু'জন। লম্বা একতলা এই দালানে কেটেছে আনিসের ছাত্র জীবনের অনেকটা সময়। এ স্কুল থেকে সেদিনই না মেট্রিক পাশ করেছে ও।

দেখতে দেখতে নয় বছর পেড়িয়ে গেছে। একাগ্রচিত্তের ভাবনা দেখে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে আনিসকে ধাক্কা মারলো এনামুল।

'কি বল?'

'কি আর বলব, তুমি ইঞ্জিনিয়ার-ফিঞ্জিনিয়ার না হয়ে কবি হলে হিট করতে।'

'কি কথার ছিরি। কেন কি দোষ করলাম?'

'না কবির মত ভাবছিলে তো, তাই।'

'কেন ভাবতে হলে কবি হতে হয় বুঝি?'

ওদের কথার মধ্যে এবাদুল, সোহান, ইমরান আসলো। আনিস বহুদিন বাদে বন্ধুদের পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। খুব মেতে উঠেছে বন্ধুদের নিয়ে। আর বেচারা এনামুল পাশে বসে বিরক্ত হচ্ছে। ও উঠে চলতেই আনিসের ডাক, 'কোথায় যাস?'

'কি করব, বসে বসে তোমাদের নাচন দেখব?'

'আমাদের নাচন দেখে কি করবি। চল পশ্চিম পাড়ায় নাকি যাত্রা হবে। ঐখানে রুপবানের নাচ দেখবি। চল।'

'কিন্তু এই বিকেলে তোমার জন্য যাত্রা হবে বুঝি।'

'আরে না হোক, পরে হবে। চল, এখানে বসে লাভ নেই।'

বন্ধুদের কাছ থেকে যাত্রার কথা শুনে যাত্রা দেখার জন্য আনিসের সে কি তাড়া। পারলে যাত্রার শিল্পীদের এখানে এনে নাচায়। ওরা সবাই পশ্চিম পাড়ায় যাত্রার মাঠে আসল। দেখে মনে হল তাবুর ভিতরে যাত্রার লোকজন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। মাঠের এক কোনায় ঘাসের উপর বসে হাসি-তামাসা আর রসবোধে মেতে উঠলো ওরা। বাদ যায়নি এনামুল।

'কেমন আছো আনিস বাবু?' হঠাৎ মেয়ে কণ্ঠে ডাক শুনে ঘাড় ঘুড়িয়ে পিছনে দেখলো আনিস। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ তাকিয়ে রইল। হয়ত অপ্রত্যাশিত কিছু দেখেছে ও।

'চিনতে পার নাই আমাকে?'

থতমত খেয়ে আনিস উত্তর করল, 'হ্যাঁ, চিনতে পারব না কেন?'

'যাক বাবা, চিনেছো তাহলে। আমি তো ভেবেছিলাম, আনিস বাবু আমাকে চিনবে না।'

আনিসকে উদ্দেশ্য করে এবাদুল জিজ্ঞেস, 'কি বন্ধু, মনে পড়ে?'

বসা থেকে উঠতে উঠতে ও উত্তর করল, 'মনে না পড়ে উপায় আছে। তোরা বস আমি আসছি।'

ফাহিমা ও আনিস ওদের ছেড়ে একটু দূরে চলে আসল।

মাঠের শেষ সীমানায় পাশাপাশি হাঁটছে দুজন। কারও মুখে কোনো কথা নেই। কি বলবে, আনিস ভেবে পাচ্ছিল না। এ সময় ফাহিমা কি ভাবছে তা খুব জানতে ইচ্ছে হলো ওর। আনিস প্রথম নীরবতা ভাঙ্গল।

'কেমন আছো তুমি?'

'জানতে চাইলে! আমি ভেবেছিলাম জানতে চাইবে না তুমি। তুমি তো আজ অনেক বড় মানুষ হয়েছ। আমার মত ক্ষুদ্র মানুষ নিয়ে ভাববে কি? যাক আমি ভালো আছি।'

'সেদিন তুমি কি আমায় স্বার্থপর ভেবেছিলে?'

ফাহিমার অট্টহাসি। হাসি যেন থামতে চায় না। আনিস কেমন যেন ওর হাসিতে অবাক না হয়ে নীরবে পায়ের নীচে চলে যাওয়া ঘাসের পানে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে রাখল। ফাহিমা হাসি থামিয়ে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'ভেবেছিলাম কি, এখনও ভাবছি। তখন ভীরু, কাপুরুষের মত পালিয়েছিলে।'

আনিসের নজর এখনও সবুজ ঘাসে আবদ্ধ। ওর মনে হচ্ছে কে যেন, কয়েক ছটাক গরম শীষা কানের মধ্যে ঢেলে দিল। ফাহিমা আবারও বলল, 'বিয়ে করেছি, একটা ছেলে আছে। স্বামীর ঘর করছি।'

আনিস শুধু মুখে শব্দ তুলল, 'ও।'

মনে হলো এসব খবর আনিস এখন মাত্র জানলো। কিন্তু এ খবর পেয়েছিলো সে দিনই। কিন্তু কিছু করার ছিলো না। বুকে পৃথিবী সমান পাথর চাপা দিয়ে থেকেছে ও। ফাহিমার কথার কি উত্তর হতে পারে, কি বা বলবে এর বিপরীতে। কেউ কোনো কথা না বলে মাঠটাকে কয়েকবার চক্কর মারল। কতবার হয়েছে কে বলতে পারে।

হঠাৎ করেই ফাহিমা বললো, 'ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি। এখন ওঠার সময় হয়েছে। কাল ঠিক এ সময় এসো। যাই।'

বলেই হন হন করে চলে গেল ও। ওর যাওয়া পথের দিকে নিরস্ত্র সৈনিকের মত তাকিয়ে থাকলো আনিস। কোন উত্তর করার সময় না দিয়েই ফাহিমা চলে গেল। কোন কোন কথা হয়ত উত্তরের আশা করে না। ফাহিমার কথাটিও ছিলো হয়তো তেমনই একটি কথা।

যাত্রা দেখা হলো না আনিসের। চলে আসলো বাড়িতে। এনামুল যাত্রা দেখতে চেয়েছিল কিন্তু একা একা দেখতে ভালো লাগবে না বলে আনিসের সাথে আসল। রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছে। এনামুল বুঝতে পেরে বলল,'ভাই, একটা কথা।'

'হু, বল।'

'উনি কে? মানে ঐ মেয়েটা?'

এনামুলের প্রশ্ন শুনে আনিস অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে এনামুলের গায়ে হাত দিয়ে আনিস বলল, 'কিরে ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

'না। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় আছি।'

'ও আমার ভালোবাসার শিক্ষক। ও শিখিয়েছে আমায় প্রেমের স্বাদ আস্বাদনের মাধ্যম। ও আমার ভালোবাসার অমরত্ব।'

'তোমরা কি একসাথে পড়তে?'

'হু, একসাথে পড়তাম। শুধু পড়তামই না একসাথে পদক্ষেপও ফেলতাম।'

কথা বলতে বলতে আনিস ফিরে গেল সেই দিনে। যে দিন প্রথম দেখা হয়েছিল ফাহিমার সাথে। তখন ক্লাস সেভেনে ওরা। লেইজার পিরিয়ডের সময় বৃষ্টি পড়ছিল সে দিন। আনিস বৃষ্টি মাথায় নিয়েই দৌড়ে এসে স্কুলের বারান্দায় উঠলো। প্রায় অনেকটাই ভিজে গেছে ও। মনে মনে গালি-গালাজ করছে বৃষ্টিকে।

'বৃষ্টিতে ভিজে মেজাজ গরম হয়েছে বুঝি?'

ফাহিমার দিকে তাকিয়ে আবার নজর বৃষ্টির দিকে ফেলে বলল, 'মেজাজ দিয়ে আর হবেটা কি? ভিজেই তো গেছি।'

'ক্লাসে এসে ফ্যানের নিচে বসো, খুব তাড়াতাড়ি ভিজে জামা অনেকটা শুকিয়ে যাবে।'
আনিস ফাহিমার কথামত ক্লাস রুমে ঢুকে ফ্যানের নিচে আসল। বিরতির সময় হওয়াতে ক্লাসের সবাই বাইরে গিয়েছে। বৃষ্টিতে বাঁধা পড়ছে সব। ক্লাস রুমে ওরা ছাড়া আর অন্য কেউ নেই। ব্যাগে করে ছোট একটা ফ্লাস্কে চা এনেছিল ফাহিমা। দপ্তরীকে দিয়ে অফিস থেকে একটা কাপ আনিয়ে তাতে চা ভর্তি করে আনিসকে দিয়ে নিজেও ফ্লাস্কের কাপে নিল ফাহিমা।
'তোমার নাম বুঝি আনিস? আজই ভর্তি হয়ে তোমাদের সাথে যোগ হলাম। এর আগে অন্য কারো সাথে কথা হয়নি আমার।'
'তুমি নাকি খুলনা শহরের বড় স্কুল ছেড়ে এখানে এসেছো।'
'হু ঠিক শুনেছো। যুদ্ধ। আব্বা আর দাদার যুদ্ধ।'
প্রথম দিনে এভাবেই শুরু হয় ওদের। হাসি-কান্নার বন্ধুত্বে কাটে ওদের পথচলা। ওদের বন্ধুত্ব প্রেমে দানাবাঁধে ক্লাস টেনে এসে। এখানেও ফাহিমা প্রথম। ফাহিমাই জানিয়েছিল ভালোবাসার কথা। বইয়ের ভাঁজে রেখে দিয়েছিল একটা চিঠি। অবশ্য সেটাকে চিঠি না বলে চিরকুট বলাই অধিক শ্রেয়। মাত্র তিন লাইনের প্রেম বার্তা, 'তোমার ভালোবাসার বন্ধনে আটকে গেছি অনেক আগে। আমার ভালোবাসার মায়ায় তোমায় আবৃত করব। তোমার বাহুবন্ধনে আমাকে ঠাঁই দিবে কি?'

এরপর ওদেরকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। একে অপরের বোঝা-পড়ার জায়গাও ছিল অসাধারণ। বেদনা-প্রসন্নতায় কেটেছে কয়েক বছর। এর মাঝে স্কুলও শেষ করেছে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ওরা। উচ্চশিক্ষার জন্য আনিস ঢাকাতে এসে ভর্তি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে, তবে ফাহিমার লেখা-পড়া আর হলো না। তার বাবা-দাদার যুদ্ধে শেষ-মেষ ওর লেখা-পড়াটাই কোরবানী হলো।

হঠাৎ করেই বিয়ে হয়ে যায় ফাহিমার। বিয়ে থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ফাহিমা অনেক চেষ্টাই করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। টেলিগ্রাফও করেছে আনিসকে। কিন্তু আনিস কি করবে? কি বলবে টেলিগ্রাফের জবাবে? এর একটাই সমাধান, সকলের অজ্ঞাতসারে ফাহিমাকে নিয়ে দূরে চলে যাওয়া। ফাহিমা তাতেও রাজি। কিন্তু এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ কি আনিসের পক্ষে নেওয়া সম্ভব? এ সমাজে কি ওরা টিকে থাকতে পারবে। সবে মাত্র ফার্স্ট ইয়ার, কি করবে আনিস? কত প্রশ্ন উকি মারে এই মস্তিস্কে। বাপের রাজত্ব থাকলে তবেই হয়তো এই কাজ করা যেত। খুব ইচ্ছে করছিল ফাহিমাকে দেখার। একটু কথা বলার। কিন্তু নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না বলে, তখন গ্রামে আসেনি আনিস। বন্ধুর কাছে একটা চিঠি লিখেছিল ফাহিমার জন্য।

হৃদয়স্পর্শী বিশ্বললনা প্রিয়তমা ফাহি,　　　　৪৪/বি ফার্মগেট, ঢাকা

আমি জানি তুমি ভালো নেই। তুমি ভালো না থাকলে, পৃথিবীতে এমন কি আছে যেটা আমাকে ভালো রাখবে? জীবনের জন্য আমরা বাস্তবতার সম্মুখীন, তবে ভালোবাসা ছাড়া জীবন মূল্যায়িত হয় না। সাগরের পানি ফোঁটায় ফোঁটায় তুললেও হয়ত এক সময় শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তোমার ভালোবাসার অমরত্ব শেষ হবে না। শেষ হওয়ার সাহস করবে না। আমরা জীবনের বাস্তবতায় বাঁধা পড়েছি। বিশাল হ্রদের মধ্যে ফেলে আমার গলায় রশি বেঁধে কেউ উপরে টানছে আধাআধি। না পারছি উপরে উঠতে না পারছি তলিয়ে যেতে।

আমার শিরা-উপশিরায় তোমার ভালোবাসা বহমান। তোমার ভালোবাসার সম্মাননা আমার জানা নাই। ভালো থেকো। তোমার প্রতি শুভ কামনা রইল।

ইতি
তোমার আনিস বাবু

কথা বলতে বলতে কখন যে গলাটা ভারি হয়ে গেল আনিসের। নিজেকে সামলানো কঠিন হলো ওর। বাহিরে প্রকাশ পায় না মনের ভিতরকার অবস্থা। কিন্তু মনের ভিতরটাতো আর নিস্তব্ধ থাকে না। প্রতিনিয়ত দুমড়ে মুচড়ে যায়।
'এরপর তোমার সাথে কি আর দেখা হয় নাই?'
'না রে। বাড়িতে আসলে কখনও দেখা করার চেষ্টা করিনি। কারণ আমি তো দেখা করার অধিকারই হারিয়ে ফেলেছি।'
'আজ কি বললেন, অনেক অভিযোগ করলেন বুঝি?'
'করার কথা কি নয়?'
'না তা বলছি না, জানতে চাইছি আর কি।'

এনামুলকে সঙ্গে নিয়ে গতকালকের সেই মাঠে আনিস। এখানে আসতে বলেছিল ফাহিমা। আনিসকে খুবই অস্থির দেখাচ্ছে। খালি পায়ে সবুজ ঘাসের উপর হাঁটছে ও। এনামুল আনিসের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হলে

বুঝি এমনটি হয়। নিয়তি কতই না খেলা করে আমাদের সাথে। ফাহিমা চলে আসল। আনিস ও ফাহিমা কথা বলতে বলতে এনামুলের দিকে আসল।

'চেন নাকি ওকে?' এনামুলকে দেখিয়ে ফাহিমাকে জিজ্ঞাসা করল আনিস।

'হু, চেনা চেনা লাগছে তবে ঠিক বলতে পারছি না।'

'এনামুলকেও ঠিক চিনতে পারলে না।'

'ও আচ্ছা, এই সেই পুচকেটা। অনেক বড় হয়ে গেছে।'

এনামুলের তীব্র প্রতিবাদ, 'পুচকে বলবে না, খবরদার।'

এরপর একরাশ হাসির বর্ষণ হলো তিনজনের মুখে। ফাহিমাকে উদ্দেশ্য করে এনামুলের জিজ্ঞাসা, 'তুমি আমাকে চেনো নাকি?'

'হুম চিনি তো। তোকে না চেনার আছি কি?'

আনিস এনামুলকে বলল, 'তুই বস। আমরা আসছি।'

ওরা হাঁটতে হাঁটতে মাঠ থেকে রাস্তায় উঠে এলো। বিশাল বিলের মাঝ দিয়ে লম্বা রাস্তা। ওরা হাঁটছে। পাশের সারি সারি গাছকে পিছনে রেখে। নিশ্চুপ ওরা। বাতাসের কোমল শব্দটা নিস্তব্ধতাকে পেয়ে একটু জোরে-সোরেই শব্দ করছে। হয়ত ওর রাজত্বে এটাই মানান সই।

'কোন কথা বলছ না যে?'

ফাহিমার প্রশ্নে আনিস উত্তর দিল, 'কি বলব? আর শুনবেই বা কি?'

'আমার একটা কথার জবাব দিবে?'

'বল, আজ যে জবাবই চাও তুমি পাবে।'

'বাহ, অনেক সাহস দেখছি। কিন্তু যখন দরকার ছিলো তখন সাহসের কানাকড়িও তো দেখলাম না।'

তারপর আবার কিছুক্ষণ কথা নেই কারও মুখে। 'তুমি আমার সাথে এ রকম করতে পারলে?' প্রশ্নটা যেন সুঁচের মত ঠেকল আনিসের বুকে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল আনিসের। হাঁটার গতি মন্থর হয়ে গেল। শক্তি পাচ্ছে না ও। বিশাল পাহাড়ের ঝর্ণাধারার ঢল হয়ত বাঁধা দিয়ে ধরে রাখা যায়, কিন্তু শূন্যতার অশ্রু কি আর বাঁধা মানে। আনিস বাঁধা মানিয়েছে অশ্রুকে। সেই ছয় বছর ধরে অশ্রুকে রেখেছে বাঁধায়। তবে হৃদয়ের কান্নাকে বাঁধা দিতে পারে নাই ও। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'বাস্তবতার সাথে আমি পারিনি, ফাহি। বাস্তবতার চাপে আমি পিষ্ট হয়েছি।'

'আমি কখনও ভাবিনি আমার আনিস এতটা ভীত হবে। আমি ভাবিনি।'

'সাহসই বা দেখাতাম কীভাবে তুমিই বল। কোন পথ কি ছিল?'

'তোমার এ অবস্থান আমি কিভাবে কোন উপায়ে মেনে নিব? এখন বাধ্য হয়ে করছি সংসার।'

'ফাহি। আজ তুমি আমাকে যে দোষ দিবে, যে অভিযোগ করবে আমি মাথা পেতে নিব। তোমার অভিযোগে আমার প্রত্যুত্তর কিছুই নাই।'

'অভিযোগ কি করব? আমাকে ভালোবাসলে তবে অধিকার দিলে না। আমাকে অধিকারও করলে না।'

'আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম, অধিকারের টের পাইনি।'

'তাহলে ভালোবাসলে কেন?'

ফাহিমার এ কথায় আনিস একদম থেমে গেল। দ্রুত গতিতে ছুটে আসা গাড়ির ব্রেক চাপলে, একটু সামনে যাবেই। কিন্তু পা তুলেও সামনের পদক্ষেপটি ফেলার আগেই থমকে গেল ও। ফাহিমার দিকে তাকিয়ে দেখল চোখে পানি ঝরছে অনর্গল। ওরা পশ্চিমে অস্ত যাওয়ার যোগাড় সূর্যের দিকে মুখ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ফাহিমা তাকিয়ে আছে ক্লান্তিতে ম্লান আলোর সূর্যের দিকে। দুই চোখ দিয়ে নোনা জলের স্রোত বইছে। সূর্যের শেষ আলোয় হালকা সোনা রূপ ধারণ করেছে ওর অশ্রুধারা। আনিসের মনে হল বিশাল আকাশে বড় বড় দুইটা ফাটল ধরেছে। যেখান থেকে পানি নেমে পৃথিবীকে ডুবাতে চাচ্ছে। বিধাতার এ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি থেকে কি কান্না আশা করা যায়? কি বলবে আনিস। কি বা বলার আছে। ফাহিমার হৃদয়স্পর্শে আনিস ওর ভালোবাসা, পাওয়া না-পাওয়া, ক্লান্তি লুকিয়েছে এক সময়। এখন নেই এতটুকু অধিকারও। পৃথিবীর সকল সুখ, হাসি, কান্না, প্রেম, বিপ্লব যেন এ চেহারাই খুঁজে পেত আনিস। কিন্তু এখন আর খোঁজা হয় না। এর মধ্যেই সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার হয়ে আসছে চারপাশ। ফাহিমা বলল, 'চল যাই।'

বাবার বাড়িতে বলেই এ রকম চলতে পারছে ফাহিমা। তার চিন্তার লেশ মাত্র নেই যেন। হঠাৎ অবাক করে দিল ফাহিমা। এ কি আবদার করল ও। কোন প্রতিবাদ না করে আনিসও সায় দিল, 'আচ্ছা আসব।'

'মনে থাকে যেন মধ্যরাত। তালতলাটাকে চিনতে পারবে তো?'

'হুঁ, চিনতে পারব।'

ডাকুয়াদের বাড়ির পিছনে ঘন জঙ্গলের পরে মাঠের পাশে ঘোটা তিনেক তাল গাছ। এই তালতলা ছিল ওদের প্রেম বিনিময়ের স্থল। এ গাছের আশ্রয়ে কত যে মধুর সময় কেটেছে আনিস ও ফাহিমার। দিনের রোদ্রৌজ্জ্বলে ও রাতের জোছনা মিশানো আঁধারিতে ওদের প্রেমমিলন হয়েছে এখানে। তালগাছগুলো আজও এক পায়ে দাঁড়িয়ে রাজত্ব করছে। কিন্তু এ দুটি মানব প্রজার মিলন হয় না অনেক বছর, তারা আর আশ্রয় পেতে আসে না। এখানেই কোন এক জোছনা ভরা রাতে ফাহিমার স্পর্শে প্রেমে অমরত্বের স্বাদ পায় আনিস। বহুবার বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ওরা। এই জায়গাই তার চিরন্তন সাক্ষী। রাত যখন পরিচ্ছন্নভাবে জেগে উঠে। তখন ঘোটা এলাকা গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যায়। এই নিস্তব্ধতাকে সঙ্গে নিয়ে সব বাঁধাকে ফাঁকি দিয়ে এখানে আসত ওরা। এক অপরের সান্নিধ্যের সুধা লাভ করত। যে সান্নিধ্য পেতে পৃথিবীর সকল প্রেমিক নারি ও পুরুষ সাত সাগর ও তের নদীর বাঁধাকে অতিক্রম করে। তাল পাতায় বাবুই পাখির সংসারের ন্যায় ওরাও সংসারের স্বপ্ন বুনেছিল এখানে এসে। জন-মানবহীন জঙ্গল ও দিগন্ত জোড়া মাঠ ওদের পদচারণায় মুখর হয়ে ভালোবাসার আহলাদ দিত। আজ মধ্যরাতে আনিসকে ঐখানে ডেকেছে ফাহিমা।

মধ্যরাতে ওকে নিয়ে অভিসারে আসতে চায় ফাহিমা। আনিসকে কাছে পেয়ে, ফাহিমা ওর হৃদয় স্পর্শের আবদারে এখানে আসবে আজ। কিন্তু বাস্তবতা কি আর সেই প্রশ্রয় দেয়। বাস্তবতা যে, ইস্পাতের ন্যায় কঠিন। হাজার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যে তালতলায় আনিস ফাহিমার সান্নিধ্যে গিয়েছিল বহুবার। তবে সে সান্নিধ্যের মধ্যে বুকভরা সাহস ছিল। আনিস চিন্তা করছে, সেই সাহস কি আজ ওর আছে। সময় স্রোত ধারার মত বহমান কিন্তু জীবন? জীবন যে তার চেয়েও বহমান। ফাহিমার ভালোবাসা, সান্নিধ্য পেতে চায় আনিস। যদি সাত জনমও প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলেও করবে সে প্রতীক্ষা। কিন্তু ফাহিমার প্রেম স্পর্শে যে ওর আর অধিকার নাই। হয়ত আজও কেউ জানবে না ওদের অভিসারের কথা। কিন্তু অধিকারের তৃপ্তি আছে কি? ফাহিমা আজও প্রস্তুত কিন্তু আনিস কি তাতে সায় দিতে পারে। এমন হাজারো কথা ভাবছে আনিস। হৃদয় টানছে ফাহিমার হাতছানিতে কিন্তু বিবেক কি টানছে ওকে? নাহ আনিস আর ভাবতে পারছে না। শত ভাবনা ও চিন্তার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে ঘরের বাইরে পা ফেলল আনিস।

মধ্যরাত শেষ হয়েছে। তিন প্রহরে রাতের বিচরণ। রাতের অবসন্নতায় ঝিমিয়ে পড়েছে সব। তাল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে ফাহিমা। অপেক্ষা আনিসের। আনিসকে নিয়ে হৃদয়ের সকল শূন্যতা দূর করবে ও। কচুপাতার রঙের শাড়ি পড়েছে ফাহিমা। আনিসের খুব পছন্দের রং। লম্বা খোলা চুল গাছের গায়ে বিস্তরভাবে ছড়িয়ে আছে। বাম কানে চুলের ভিতর তাজা গন্ধরাজ ফুল। মাটির উপর আলতা মাখা খালি পা দুটিও যেন নিশ্চুপ। বিশাল অপেক্ষা ওর। মায়াবী কোমলতায় রাতের শেষ প্রহরেরও শেষ হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরই পূর্ব আকাশে ঊষার আবর্তনের দেখা মিলবে। এরপরও বহমান রাতে আনিসের অপেক্ষায় স্থির ও। যতই হোক আনিস আসবেই। ঘন জঙ্গলের নীরবতাকে ভেঙ্গে চাপা শব্দ কানে এলো ফাহিমার। এই বুঝি আনিস আসলো। একটু দূরে ঝোপ থেকে পাখা ঝাপটিয়ে একটা বাদুর চলে গেল শুধু। সবার থেকে ভিন্ন ও। ভোরেই হয়ত ওর নীড়ে ফেরার সময়।

রাতের শেষ প্রহর। ২৯ আষাঢ়, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
৩৯৭ কবি আহসান হাবীব সড়ক, পিরোজপুর।

গতরাত

সন্ধ্যা থেকেই আকাশে পূর্ণ চাঁদ। আজ মনে হয় পূর্ণিমা অথবা নয়। এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না কিবরিয়া। ও ক্ষণিক হাঁটছে আকাশের দিকে চেয়ে আবার ক্ষণিক হাঁটছে রাস্তার দিকে চেয়ে। আধা গ্রাম আধা শহরের রাস্তা। আজ প্রায় ছয় মাস পরে ও বাড়ির পথে। নিজের কাছে বেশ ভালই লাগছে। বরিশালের মেহেদীগঞ্জে বাড়ি ওর। নদীর মায়ার কোমলতা দিয়ে ঘেরা ছোট্ট এক শহর। কিবরিয়া চলছে বহুদিন পর বাড়ি ফেরার আনন্দ নিয়ে। বহুদিন বাদে পরিবার, বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা হবে। উল্টো পথ দিয়ে এগিয়ে আসছিল রিফাত। ইলেকট্রিসিটির আলো ও চাঁদের ঈষৎ আভায় ওকে অনেক রোগা মনে হচ্ছে। কাছে আসতেই কিবরিয়া ওকে ডাকলো, 'রিফাত'।

হঠাৎ কিবরিয়াকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ওঠে রিফাত বলল, 'কিবরিয়া, কখন এলি তুই?'

'এইতো মাত্রই আসলাম।'

'কোথা থেকে আসলি?'

'কোথা থেকে আবার? কুমিল্লা থেকে।'

'কয়দিনের জন্য আসলি এবার।'

'এইতো দিন বিশেকের জন্য। আরে আমার কথা বাদ দে। শাহীন, সাদি, সেলিম ওদের খবর কি?'

'ভালই আছে ওরা। তোকে খুব মিস করিরে বন্ধু।'

'তোরা কি এখনও নেশা করস?' করুণ নয়নে রিফাতের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল কিবরিয়া।

'এটা একবার ধরলে আর ছাড়া যায় না। ছাড়তে চাইলেও ছাড়া যায় না বন্ধু।'

'এখন কোথায় যাস?'

'বাজারের দিকে যাব একটু।'

'তোরা তো এখন বাজারেই থাকবি, তাই না?'

'হ্যাঁ থাকব।'

'তাহলে আমি বাড়িতে গিয়ে এখনই আসছি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

রিফাত, কিবরিয়া, শাহীন, সাদি ও সেলিম ওরা সেই ছেলেবেলাকার বন্ধু। ওরা একে অপরের কত্তো কাছাকাছি। মাধ্যমিক থেকে ওদের এক সাথে পড়াশুনা। তবে সবার এক সাথে এসএসসিটা পাশ করা হয়নি। সাদি আর কিবরিয়া এসএসসি পাশ করেছে, কিবরিয়া এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আর দুইবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে সাদি এখন এলাকার কলেজে ডিগ্রি পড়ে। আর রিফাত, শাহীন, সেলিমের এসএসসি পাশ করা হয়েছে তিনবার পরীক্ষা দিয়ে। তারপর কলেজ পর্যন্ত এসে আর পড়া হয়নি। এখন ওদের দিন কাটে বাপের হোটেলে খেয়ে, অশান্তিতে। কোন এক পাপ যেন তাদের জীবনটাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। ওদের কাছে এখন জীবন মানেই অস্বস্তি আর হতাশা। একটা অনুশোচনায় ওরা আটকে আছে যেন। একটা পাপের পরবর্তী ফল হিসেবে ওদের দিন কাটে, এখন মদ-সিগারেট-গাজা আর অশান্ত মনের শান্তির জন্য টাকার বিনিময়ে নারী। ওদের থেকে সবচেয়ে ভালো আছে কিবরিয়া। ওদের ভিতর কিবরিয়া এখন আদর্শ। কিবরিয়া জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সম্মানজনক ভাবে কাজে লাগিয়েছে।

হাতে ব্যাটারির টর্চ নিয়ে কিবরিয়া ঘর থেকে বের হল। টর্চের ক্লান্ত আলো রাস্তায় ফেলে বাজারের দিকে যাচ্ছে ও। রাত নয়টা এখন। ছোট মফস্বলের ধারা বাহিত চুনারচর গ্রাম। হালকা করে শহুরে ছোঁয়া মাখা গ্রাম। রাতের প্রথম প্রহরে টুনটুন বেল বাজিয়ে রিকসা চলছে দু-একটা। পাদানির নিচে হারিকেনের সলতের মিটমিট আলোটা যেন বাতাসের সাথে প্রতিযোগিতায় দুলছে। ঝাকুনিতে কাঁপছে আলোটা।

কিবরিয়া এসে গেছে তার চিরচেনা বাজারের খুব কাছে। আর মিনিট খানেক লাগবে। সামনের মোড়টা ঘুরলেই ওদের ছোট্ট বাজার। বাজারের প্রথমেই আবুল হোসেন ভাইয়ের চায়ের দোকান। ওখানে বসেছিল রিফাত, শাহীন, সাদি ও সেলিম। এ চার কাস্টমার বাদে অন্য কাউকে দেখতে পেল না কিবরিয়া। কিবরিয়াকে দেখতে পেয়ে শাহীন, সাদি ও সেলিম ওকে জড়িয়ে ধরল।

বহুদিন পর বন্ধুকে কাছে পাওয়া বলে কথা। বন্ধুদের অভিনন্দনের পালা শেষ হতে মিনিট পাঁচেকের মত সময় লাগল। দোকানের মালিক আবুল হোসেন মুখ তুলে কিবরিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে আইলা কিবরিয়া?'
'এইতো সন্ধ্যায়, তুমি কেমন আছো আবুল ভাই?'
'আমাগো আর থাহা।'
'আরে এ কথা বলছ কেন? তোমরাও দেশের সম্পদ।'
আবুল হোসেন মুখে একটা মুচকি হাসি তুললো। কিবরিয়া ওদেরকে তাড়া দিল, 'কিরে তোরা কি এখানে বসে থাকবি? ওঠ।'
কিবরিয়ার তাড়া খেয়ে ওরা আবুল হোসেনের চায়ের দোকান থেকে উঠল।
আবুল হোসেন কিবরিয়াকে বলল, 'কিবরিয়া, চা খাইয়্যা যাও।'
'এখন না আবুল ভাই। পরে খাব। আছিতো অনেক দিন।'

ওরা পাঁচ বন্ধু হাঁটছে অন্ধকার রাস্তায়। এই অন্ধকার রাস্তায় হাঁটার স্বভাব ওদের বহু পুরোনো। বাড়িতে আসলে কিবরিয়া এটাকে খুব উপভোগ করে আর দূরে থাকলে এটার খুব অভাব বোধ করে। এই নিস্তব্ধ রাতে হাঁটতে হাঁটতে বন্ধুদের মাঝে অনেক না বলা কথার বিনিময় হয়। কিবরিয়া বাদে বাকি চারজন বদের হাড্ডি। মেয়েদের শরীরের প্রতি এই চারজনের লোভ অতিমাত্রায়। লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েদের গোসল দেখা, রাতে বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে মেয়েদের শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে পানি দেওয়া, লাঠি দিয়ে কাপড় ওলট-পালট করা এদের নিত্য দিনের স্বভাব। ভাবটা এমন যেন, মেয়েদেরকে এরা আস্ত গিলে খাবে। কখনও এসব কাজে সঙ্গ দেয়নি কিবরিয়া। এভাবেই চলত ওদের ছেলেবেলা। অবশ্য এখন ওদের চরিত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। কোন একটা ঘটনা ওদের ব্যথাদেয় সব সময়।
'তো তোদের দিন কাল এখন কেমন যাচ্ছে?' কিবরিয়া বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল।
একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে রাফি বলল, 'আমাদের আর দিন কাল।'
'আহা, নতুন করে আবার কি জীবন শুরু করা যায় না?'
'শোন, জ্ঞান দিবি না। ভাল লাগে না এইসব কথা শুনতে।'
'আচ্ছা ঠিক আছে আর বলব না। তবে তোরা কি আর এই নেশার পথ ছাড়বি না?'
'আরে নেশা বলছিস কেন? এটা খুবই শান্তির মামা। এগুলো খেতে পারলেই না নিজেকে খুব ভালো মনে হয়।' বহু কষ্টে কথা গুলো বলল সেলিম। ওর হাতে একটা দেশি মদের বোতল। তার অর্ধেক খালি। কখন ওটা হাতে নিয়ে অর্ধেক করে ফেলল তা মোটেও খেয়াল করেনি কিবরিয়া। দুলতে দুলতে হাঁটছে সেলিম। মদের বোতলটা নিতে গিয়েও নিল না কিবরিয়া।
'সেদিন রাতে কি যে করে বসলাম মামা। মাথা ঠিক ছিল না মোটেও।' সেলিম বলল। সাদি কিবরিয়াকে বলল, 'জানিস কিবরিয়া, সেদিনের পর থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি খারাপ ছেলে মনে হচ্ছে। কিন্তু দেখ আগে কত আজে-বাজে কাজ করেছি, একটি বারের জন্যও খারাপ মনে হয়নি নিজেদের।'

২

কিবরিয়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাড়ির দিকে। মাথার উপর সূর্য খাড়া হয়ে তেজ ছড়াচ্ছে সমানভাবে। মেঠো পথের দুই পাশে সুপারি আর আম বাগান। সুপারি গাছের লম্বা লম্বা সারির মাঝখানে ছায়া আর সূর্যের আলো খেলা করছে। বাতাসের তালে তালে গাছের ছায়াগুলো কাঁপছে। আম-সুপারির কালো এই বাগান থেকে বিরতিহীনভাবে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। বসন্তের মাঝামঝি, প্রকৃতির কোলে বসন্ত পূর্ণতা লাভ করেছে যেন। কিবরিয়া রাস্তার মোড় ঘুরে বাম দিকের রাস্তায় চলল। এই মোড়ে রিফাতের সাথে দেখা হল কিবরিয়ার। কিবরিয়া ওকে ডাকল, 'রিফাত, কই গেছিলি?'
'সিনেমা দেখতে গেছিলাম।'
কিবরিয়া অবাক হয়ে বলল, 'তুই এখন সিনেমা দেখতে গেছিলি আর কয় দিন পর না আমাদের পরীক্ষা।'
'তো কি হয়েছে। পরীক্ষা দেব, তোর মত আমার এত পড়াশুনা করতে ভালো লাগে না।'
'আজ আমাদের আরও একটা পরীক্ষা হয়েছে। তোর আজ কোচিংয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'
'ঠিক আছে কাল থেকে যাব বন্ধু, এবার আসি।' বলে রিফাত দ্রুত হাঁটা ধরল। কিবরিয়া রিফাতের যাওয়া দেখল। কিবরিয়া ভাবল কি যে হল রিফাত, সেলিম, সাদি ও শাহীনের। পড়ালেখা করছে না তেমন। আর দুই মাস পর এসএসসি পরীক্ষা। কে জানে ওদের পড়ালেখার খবর? ক্লাসেও যায় না ঠিক মত।

বিকেল বেলা সূর্যের পড়ন্ত আলো নদীর পানিতে ঝলমল করছে। ঢেউয়ে পানির ঝলমল আরও সুন্দর লাগছে। বাতাসে তালে তালে কলমি লতাগুলো সাদা ফুল নিয়ে দুলছে। বাতাসে একটা শো শো শব্দ হচ্ছে। নদীর পাড়ে রাস্তার দুই ধারে বছরের পর বছর দাঁড়ানো লম্বা লম্বা তালগাছে ঝুলে পড়া শুকনো পাতা বাতাসের তোড়ে খস খস শব্দ করছে। সারাদিন অনেক পড়াশুনা করেছে কিবরিয়া। এখন ও মনোরম বাতাসে বেরিয়েছে, নদীর পাড়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বটতলার দিকে। ওখানে বন্ধুদের দেখা পাবে।

বটগাছের বড় কয়েকটা শিকড়ের উপর বসে গল্প করাছিল ওরা। এক একজন বট গাছের বিশাল গোড়ার এক এক প্রান্তে বসে গল্প করছে আর হাসছে ইচ্ছা মত। কিবরিয়াকে আসতে দেখে শাহীন বলল, 'ঐ যে দেখ আমাদের বিদ্বান বন্ধু জনাব আইনস্টাইন আইতাছে।'
শাহীনের কথায় বাকীরা কিবরিয়ার দিকে ফিরে তাকালো। কিবরিয়া ওদের কাছে এসে বলল, 'কি ব্যাপার তোদের, আমাকে রেখে তোরা আগে আগে এসে বসেছিস?'
কেউ কোন উত্তর না করে একযোগে হেসে ওঠল। হাসতে হাসতে সেলিম বলল, 'তোমার আবার কি বন্ধু, তুমি তো সারাদিন খালি পড়ো। এত পড়াশুনা করে কি হবে শুনি?'
'পড়াশুনা করে কি হবে মানে। পরীক্ষা শুরু হতে আর মাত্র দুই মাস বাকী।'
'জানি, জানি। তোর বলতে হবে না।' শাহীন বলল।
কিবরিয়া ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'তো তোদের পড়াশুনার কি খবর বল।'
সাদি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এ থাম, থাম। এত পড়াশুনার কথা শুনতে ভালো লাগে না। তার চেয়ে বরং শাহীন আজ একটা অভিযান করেছে, সে কথা শোন মজা পাবি।'
কিবরিয়া একটা শিকড়ের উপর বসতে বসতে বলল, 'কি অভিযান?'
রিফাত বলল, 'আরে মামা জব্বর অভিযান। শাহীন আজ দুপুরে মিয়া বাড়ির পুকুরে Live দেখছে।'
'আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না।' কিবরিয়া বলল।
সাদি রিফাতকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ও তোমার তো আর এসব মাথায় ঢুকবে না। তো চাদু, শাহীন আজ মিয়া বাড়ির মেয়েদেরকে পুকুরে গোসল করার সময় ল্যাংটা দেখেছে।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল।
'তোরা এখনও এসব করে বেড়াস?' কিবরিয়া রেগে উঠে যেতেই রিফাত ওকে টেনে ধরল।
'আরে, দাঁড়া মামা, একটু বস।'
অনেক জোর করেই কিবরিয়াকে বসিয়ে রাখল ওরা।

শাহীন বলতে শুরু করল, 'দুপুরে মিয়া বাড়ির বাগান দিয়ে যাচ্ছিলাম। বাগান দিয়ে যাওয়ার পথে শুনতে পেলাম কয়েকটা মেয়ে কথা বলছে। কথা বলছে আর হাসছে। বুঝতে পারলাম পাশের পুকুর ঘাট থেকে কথা আসছে। আমি ধীরে ধীরে পুকুর পাড়ে ঝোপের মধ্যে গিয়ে বসে পড়লাম। তাকিয়ে দেখলাম পুকুরের ওপারে ঘাটে সে কি অবস্থা, আমি তো শেষ। তিনটা মেয়ে গোসল করছে, দুটার গায়ে জামা নেই। গামছা পেচিয়ে গায়ে সাবান মাখছে। কি কচি দেহ। নাদুস-নুদুস তা কি ভোলা যায়।' শাহিনের চোখে এখনও যেন দুপুরের সেই লালসা লেগে আছে।
কিবরিয়া আর বসতে পারল না, ও উঠে বলল, 'তোরা কি সারাজীবন এমনই করে যাবি। মোটেও ঠিক হবি না!'
কিবরিয়া রাগন্বিত হয়ে কথাগুলো বলে চলে যেতে পথ ধরল। পিছন থেকে সাদি ডাকল, 'কিবরিয়া দাঁড়া, শোন, দাঁড়া।'
কিবরিয়া ওদের ডাক কানে না তুলে চলে গেল। ওরা আবারও বলতে শুরু করল। কথার মাঝে সেলিম বলল, 'এই, শোন, আজ আমি একটা জিনিস চুরি করেছি।'
সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি কি?'
'মেয়েরা জামার নিচে যে জামাটা পড়ে, তার নিচে আরো ছোট যেটা পড়ে সেটা। কি সেটার নাম বলতে পারিস।' সেলিম সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল।
সাদি বলল, 'আমি জানি ওটার নাম...।'
রিফাত সেলিমকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে চুরি করলি ওটা?'
সেলিম উত্তর করল, 'পাশের বাড়ি থেকে চুরি করেছি গতরাতে। ঐ বাড়ির মেয়েটি যে রুমে ঘুমায় সে রুমের জানালা খোলা ছিল। রাতে মেয়েটা ঘুমিয়ে ছিল। ওখানে জানালার পাশের আলনা থেকে চুরি করেছি।'

কিবরিয়া চিন্তা করছে, ওরা কি করছে এসব। কোন পড়ালেখা নেই। এভাবেই চলবে ওদের জীবন। কবে ভালো হবে ওরা। ততোক্ষণে তো বেশি দেরি হয়ে যাবে। দিনের আলো নেই বললেই চলে। পশ্চিম আকাশে রংধনু দেখা গেল। পাখিরা মাথার উপর দিয়ে যে যার ঠিকানায় যেতে লাগল। মাগরিবের আজানের ধ্বনি কিবরিয়ার কানে আসলে ও নদীর পানির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে উঠে চলল মসজিদের উদ্দেশ্যে।

৩

প্রায় আট মাস হল কিবরিয়াদের এসএসসি পরিক্ষা শেষ হয়েছে। এখন কিবরিয়া ঢাকার একটা কলেজে পড়ে। বন্ধুদের মাঝে শুধু কিবরিয়াই ঢাকায় পড়াশুনার জন্য এসেছে। কিবরিয়া এসএসসি পাশ করেছে ভাল রেজাল্ট পেয়ে। বাকিদের মধ্যে শুধু রিফাত পাশ করেছে টেনেটুনে। সাদি, শাহীন ও সেলিম ডাব্বা মেরেছে ভালভাবেই। তবে এ নিয়ে ওদের মাঝে কোন চিন্তা নেই। ওরা আছে আগের মতই।

গরমের এক রাতে সাদি, শাহীন, সেলিম, রিফাত রাস্তায় হাঁটছে আমোদের সাথে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে কিছুক্ষণ হল। সবাই মিলে এলাকার রাস্তায় রাস্তায় আড্ডাবাজি করছে। রাত বেশি হয় নাই, আবার কমও বলা যায় না। একটা বাজে এখন। হঠাৎ সাদি বলল, ‘আমাদের জীবনটাই দেখ। কি করলাম আর কিবরিয়া এখন ঢাকায় পড়ে।’

সেলিম বলল, ‘আরে শালায় একটা জিনিস। আর আমাদের মাথায় তো গোবর ছাড়া কিচ্ছু নাই।’

‘এই দেখ দেখ। সামনে কি আইতাছে।’ শাহীন কিছু একটা দেখিয়ে সকলকে বলল। সবাই সামনের দিকে তাকাল।

রাতটা তেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। আবার তেমন চাঁদের আলোও নাই। পূর্ণিমার রাত নয় তবে পূর্ণিমার কাছাকাছি কিছুটা বলা যায়। সব কিছু স্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও অনেকটা দেখা যায়। ওরা দেখল যে, একটা মাঝ বয়সি মহিলা আসছে ওদের দিকে। ত্রিশের কোটায় বয়স হবে হয়ত। মহিলাটা ওদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। ওদের কাছাকাছি আসলে ওদের কেউ মহিলাকে লক্ষ্য করে শিষ দিল। কিন্তু তাতে মহিলার দিক থেকে কোন প্রতিউত্তর আসল না। ওরা অনেক উত্তেজনামূলক কথা বলল মহিলাটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাতেও মহিলাটার থেকে কোন জবাব আসল না। এতে ওদের আরও সাহস বেড়ে গেল। ওদের ভিতর থেকে একজন মহিলাটার হাত ধরল, তাতেও কোন প্রতিউত্তর না পেয়ে ওরা মহিলাটাকে রাস্তার পাশে একটা ঝোপের ভিতর নিয়ে গেল।

ঝোপের ভিতর থেকে হালকা গোঙ্গানির শব্দ হল ঘন্টা দুয়েক। এই ছেলের দল মহিলাটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে রেখে চরম উত্তেজনার সুধা পান করল। এক সময় ওরা ক্লান্ত হয়ে মহিলার নিস্তেজ দেহটাকে ঝোপের ভিতর ফেলে দিয়ে চলে এলো। ওদের সবার ভিতর একটা তৃপ্তি দেখা গেল। ওরা সবাই খুশি। এরকম একটা কাজ ওরা এত সহজেই করতে পারবে ভাবেনি কখনও।

পরদিন দুপুরে ওরা আবুল হোসেন ভাইয়ের চায়ের দোকানে বসে গল্প করছে। সাদি, রিফাত, শাহীন, সেলিম ওরা একে অপরকে বলছে গতরাতের কাহিনী। যদিও কাজটা সবাই একসাথে একই জায়গায় করেছে। কার কাছে কেমন লেগেছে, কে কি রকম করেছে, বলছে সব।

আবুল হোসেন ভাই দেখলেন রাস্তার ওপারে বেঞ্চে বসে ওরা কি যেন বলছে আর হাসছে। ওদের এরকম হাসি আর গোপন আলাপচারিতা আগে কখনও তিনি দেখেন নাই। কথা বলার সময় ওরা দেখতে পেল একজন মহিলা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এদিকে আসছে। ওরা মহিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আর একটু কাছে আসার পর বুঝতে পারল গতরাতের সেই মহিলাটা। ভয়ে ভয়ে ওরা উঠে দাঁড়াল। মহিলাটি দোকানের সামনে এসে আবুল হোসেন ভাইয়ের সামনে দাঁড়াতেই, আবুল হোসেন ভাই মহিলাটিকে কলা আর রুটি খেতে দিল। সাদি, রাফি, শাহীন, সেলিম অনেক্ষণ দেখল মহিলাটিকে। ওরা বুঝলো যে মহিলাটি একটা পাগল। ওদের চোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

মধ্যাহ্ন। ২৮ বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ। কুমিল্লা

কুয়াশায় ঢাকা

১

রামনগর মনিপুরী এলাকায় ঢুকতেই নীলকণ্ঠ টি স্টল। সেভেন লেয়ারের চা পান করছিল আবিরসহ ওর তিন বন্ধু। শীতকালীন অবকাশে শ্রীমঙ্গলে এসেছে ওরা। গবেষণার কাজে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওদেরকে পাঠানো হয়েছে। মনিপুরীদের উপর কাজ করছে ওরা। বিভিন্ন গ্রুপের মত ওরা চারজন এক গ্রুপে। কাজের ফাঁকে চা বিরতি নিয়েছে। বিরতি শেষে ওরা উঠলো। আবির বাকিদের বলল, 'তোরা এগো। আমি একটু আসছি।'

আবির টি স্টল থেকে সামনে এগিয়ে রাস্তা পার হল। ওখানে ফিনলে টি স্টেটের সীমানায় চারু দাঁড়িয়েছিল। আবির কাছে এসে বলল, 'ডাকেছো কেন? বল।'

'তোর কাছ থেকে প্রথম এ বাক্য আশা করিনি।' মুখে পরিহাসের হাসি দিয়ে আবির জিজ্ঞাসা করল, 'কি আশা করেছো তাহলে?'

'আমাকে এখানে দেখে তোর কি জানতে ইচ্ছে করছে না, কেন এখানে আমি?'

'না ইচ্ছে করছে না। হয়তো কোন কাজে এসেছ।'

'তুই এখানে কেন?'

' University থেকে কাজে পাঠিয়েছে।'

'ও, আমি তরুণের সাথে এসেছি, ওর অফিস একটা কাজে পাঠিয়েছে এখানে।'

'কোথায় উনি?'

'বাগানের ভিতরে। শ্রমিকদের সাথে।'

'আচ্ছা। আমি যাই, কাজ আছে।'

'এই শোন। কোথায় উঠেছিস?'

'একটা রেস্ট হউজে।'

'কয় দিন থাকবি?'

'এইতো আর দুই দিন।'

'আমি ফিনলের একটা Rest House এ উঠেছি ওর সাথে, চৌরাস্তা দিয়ে একটু সামনে। তুই একটা কাজ করবি?'

'কি?'

'রাত সাড়ে আটটায় চৌরাস্তায় আসবি? কথা আছে।'

'পারব না, আমার কাজ আছে।'

আবির পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করল। চারু আবারও বলল, 'আসিস কিন্তু, আমি অপেক্ষায় থাকব।'

আবির এখন চারুর প্রতিটি কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঠিক তিন বছর আগে এরকম ছিল না। চারুর প্রতিটি কথা শুনতে চাইত ও। চারুর কথা শোনার জন্য ও উদগ্রীব হয়ে থাকত সে সময়। বাতাসে কান পেতে থাকত আবির। চারুর কথা হয়ত বাতাসে ভেসে আসবে বলে। সামাজিক বাস্তবতার জন্য আবির এখন ধরা দিতে চায় না চারুর সামনে। চারু যখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আবির তখন ক্লাস নাইনে। তখন থেকেই চারুর প্রতি আবিরের ভালোবাসার শুরু। চারু নামটির জন্য আবির ছিল পাগল প্রায়। পাশাপাশি বাড়ি ওদের। সব সময় চারুকে দেখতে চাইত আবির, এক দিন ওর দেখা না পেলে ঝর্ণার মত অস্থির থাকত আবির। চারুর গন্ধে আবির সদা বিভোর থাকত। দিনের পর দিন চারুর যাওয়া আসার পথে দাঁড়িয়ে থাকত যেন চাতক আবির। তারপরও চারুর কাছে কখনও প্রেমের আবেদন করা হয়নি। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভবনায় ভীত হয়ে। কিন্তু বলতে চেয়েছে নিজের মত করে। চারু এক সময় বুঝতে পেরেছে আবিরের ভালোবাসা কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। চারুর উপর কেমন যেন একটা অধিকার অনুভব করত আবির। এরপর কোনো এক দিন সেই অধিকার হারিয়ে যায়। কোন এক মাসের পাঁচ তারিখ।

রাত আটটা। রেস্ট হাউজের নিচে দাঁড়িয়ে আছে আবির। অন্যরা মেতে আছে বিভিন্ন খেলা নিয়ে। রাস্তা দিয়ে কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। বেশ কনকনে শীত। আবির পায়চারি করছে আর চিন্তা করছে, যাবে কিনা চৌরাস্তায়। যাওয়াটা কি উচিত হবে? না কি হবে না। তরুণ যদি চারুকে আসতে না দেয়। আবির ভেবে পাচ্ছিল না, কি করা উচিত। যেতেও ইচ্ছে করছে। বার বার তরুণের চিন্তা মাথায় আসছে। চারুর সব কিছুতে আজ শুধু তরুণের অধিকার। এক এক করে তিনটি বছরেরও

বেশি কেটে গেল তরুণের সাথে চারুর বিবাহিত জীবন। তরুণ একটা টি স্টেটের এসিসট্যান্ট ম্যানেজার। ঢাকায় কোম্পানীর গাড়ি-বাড়িও আছে ওর।

নাহ আবির আর চিন্তা করতে পারছে না। ও হাঁটা দিল চৌরাস্তার দিকে। আবির কুয়াশা ভেদ করে হাঁটছে আর চিন্তা করছে, কি হবে চারুর সাথে দেখা করে? কেন ডেকেছে চারু?

আধা ঘন্টা ধরে আবির চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। নয়টা বাজে এখন। চারু ওকে সাড়ে আটটায় আসতে বলে নিজেই আসে নাই। আবির ভাবছে চারু হয়তো আসবে না, হয়ত বা ওর মনেই নেই। নিজেকে নিজেই উপহাস করল আবির। ঠিক তখনই পিছন থেকে চারুর ডাক শোনা গেল। চারু আবিরের সামনে এসে দাঁড়াল। লাল পাড়ের কালো রঙের শাড়ি সুন্দর কুচি দিয়ে পড়েছে চারু। ঘৃত রঙের একটা শাল মাথার উপর দিয়ে দুই বাহু ঢেকে নিচের দিকে ঝুলে আছে। মাথার চুল লম্বা বেনী করে ডান কাঁধের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে চারু। বেনীর মাথায় বেলী ফুলের মালা জড়ানো। এই কুয়াশা ঢাকা শহুরে রাস্তার পাশে ওকে বেশ নিষ্পাপ কামনীয় লাগছে। চারুই প্রথমে কথা বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলাম বুঝি?'

আবির কোন উত্তর না করে বলল, 'কেন ডেকেছ বল?'

'বাহ, বেশ দেখাচ্ছে তোকে, আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছিস তুই।'

'কি বলবে তাড়াতাড়ি বল, আমার কাজ আছে।'

চারু ভেবেছিল এই কথার বিপরীতে আবির বলবে কেমন দেখাচ্ছে চারুকে। কিন্তু আবির এড়িয়ে যাচ্ছে। চারু আজ আবিরের পছন্দের রঙের শাড়ি পড়েছে, চুলের বেনীতে আবিরের প্রিয় বেলী ফুল জড়িয়েছে। আবির ওর দিকে তাকাতে চাচ্ছে না যেন। চারু বেশ কষ্ট পেল। চারুকে চুপ করে থাকতে দেখে আবির প্রশ্ন করল, 'তরুণ ভাই তোমাকে আসতে দিয়েছে ?'

'আবির আমার দিকে তাকাতো, আমাকে দেখতে কি তোর ঘৃণা লাগে।'

'না, আমি তো কখনও বলিনি, তোমাকে ঘৃণা করি।'

'এখানে আমি আর তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি তোর সাথে কথা বলছি আর তুই অন্য দিকে তাকিয়ে আছিস। এর মানে কি এটা নয়?'

'কোন অধিকারে তোমার দিকে তাকাবো আমি? এ অধিকার তো শুধু অন্য একজনের।'

'এই অধিকার তো তুই কখনও চাস নাই।'

'আমি চাই নাই ঠিক। তবে তুমি তো চাওয়ার সময়ই আমাকে দাও নাই।'

'তুই কি আমাকে ভালোবাসিস?''

'এটাতো তোমার না জানার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, আমি জানি।'

'তাহলে এটা জিজ্ঞাসা করার অর্থ কি?'

'তুই কি আজও আমায় পেতে চাস?'

'প্রশ্নটা খুবই সহজ কিন্তু উত্তরটা খুবই জটিল। তুমি কি জান না যে, চাইলেই সব পাওয়া যায় না। কি আছে আমার? আমি সামান্য একজন। আর তরুণের কি নাই বল? বাড়ি-গাড়ি-অধিক বেতনের চাকরি।'

চারুর চোখে পানি দেখে আবির উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, 'একি তোমার চোখে পানি! এটাতো তোমার চোখে শোভা পায় না।'

'তুই আমাকে টাকার দরে বিচার করলি?'

'না, না তা কেন? আমি তোমায় এ দরে বিচার করার কে? আমার বিচারে তোমার কি এলো-গেল?'

'তুই আমাকে শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝলি?'

'আহা, ভুল বুঝবো কেন? তুমি আজ সফল এক দায়িত্বশীল বউ আর আমি ...। থাক না-ই বললাম আর।'

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। চারপাশটা একদম নীরব। চারিদিকে একেবারে গাঢ় কুয়াশার কারনে মানুষজন নেই।

'আবির আমার দিকে দেখ, তোর পছন্দের শাড়ি পড়েছি আজ। পছন্দের ফুলও।'

'এখন আর কি লাভ? এখন যে সায়াহ্ন সময়।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে চারু আবিরকে বলল, 'তুই না একদিন বলেছিলি, আমার হাত ধরে কুয়াশার ভিতর হাঁটবি। দেখ এখন কত কুয়াশা।'

'আজ তা আর হবে না। হাত ধরে হাঁটতে একটা পথ দরকার কিন্তু এখন তোমার পথ আর আমার পথ একদম ভিন্ন। এটাতো আর সম্ভব করা যায় না।'

'জানিস, আমি মা হতে চলেছি।'
'খুবই খুশির খবর। খুবই খুশির খবর এটা।' এবার আবিরের চোখের কোনা বেয়ে নোনা পানির ধারা বইছে।
'তুই কাঁদছিস কেন, খুশি হস নাই মোটেও।'
'তুমি আজও জানলে না যে, খুশিতেও কাঁদা যায়। আরে আমার ভালোবাসার মানুষ মা হতে চলেছে, খুশি না হয়ে কি পারা যায়?'
আবিরের সেল ফোনটি বাজচ্ছে বার কয়েক, 'আমাকে যেতে হয় এবার।'
আবির ঘুরে হাঁটা ধরতেই চারু পিছন থেকে ওর বাম হাতটি ধরল। আবির ফিরে তাকালো, 'আবার কেন হাত ধরলে তুমি? সেই দিনের তোমার হাতের ছোঁয়া যে আজও আমায় ঘুরে ফিরে তাড়া করে।'
চারু বলল, 'কালকের রাতে ঠিক এসময়ে এখানে আসবি?'
'আমাকে আর পিছু ডেকো না। আমাকে চলতে দাও আমার মত।' আবির জোরে হাঁটা ধরল।
'আমি কিন্তু অপেক্ষায় থাকব।' পিছন থেকে শুনতে পেল আবির। কোন প্রতিউত্তর না করে জোরে পা চালাল ও।

রেস্ট হাউজের নিচে নাইম আর মারিয়া দাঁড়ানো ছিল। আবিরকে আসতে দেখে ওরা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় গিয়েছিলি?'
'কেন কি হয়েছে?'
'ক'টা বাজে খেয়াল আছে।'
আবির হাত ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে দশটা বাজে।
নাইম বলল, 'ডিনার দশটায় শেষ হয়েছে, আর এখন জিজ্ঞাসা করছিস কি হয়েছে? চল, খেতে চল, তোর অপেক্ষায় ছিলাম আমরা।'
ওরা ডাইনিং এর দিকে চলে গেল। খেতে বসলো একসাথে।
'আবির আজ সারা দিন তুই পেঁচার মত মুখ করে আসিছ। মানুষ এমন কি চলতে পারে। কারণটাও বলছিস না।' নাইম একশ্বাসে কথাগুলো বলল।
মারিয়া বলল, 'কিরে, কি হয়েছে তোর? মন এতই ভারাক্রান্ত ?'
আবির মারিয়ার দিকে চোখ তুলে তাকাল। কৃত্রিম একটা হাসি ছেড়ে বলল, 'না আমার তো মন খারাপ না। কিছু হয়ও নাই। এইতো আছি।' ওরা আর কোন কথা বলল না। আবির একটু খেয়ে আর খেল না, বাকি খাবার রেখে উঠল ও। নাইম জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে উঠে গেলি যে?'
'খেতে ইচ্ছে করছে না।'
আবির হাত ধুতে বেসিনের দিকে চলে গেল। নাইম আবিরের চলে যাওয়া দেখল।

২

মধ্যরাত এখন। দেয়াল ঘড়ির কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। সারাদিনের পরিশ্রমে সবাই ক্লান্তির ঘুমে ডুবেছে। একদম পিনপতন নীরবতা। আবিরের পাশে হাফিজ অঘোরে ঘুমাচ্ছে। আবির লেপের ভিতর থেকে চোখ মেলে আছে। ঘুম আসছে না ওর। ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে ওর। প্রতিটি দিনই ছিল চারুর সাথে জড়ানো। পাশাপাশি বাড়ি ওদের। আসা যাওয়ার মধ্যেই দিন কাটে ওদের। আবির ইচ্ছে করেই চারুর সামনে যেত, যখন চারুর প্রতি ওর ভালোলাগা শুরু হয়। চারুর বিচরণের সকল পথ আবিরের পরিচিত। এসবে অবাধে বিচরণ করত ও। হাসি-তামাশায় মেতে থাকতো ওরা। এক সাথে খেলেছে যে কত খেলা। এভাবে চলছিল ওদের জীবন। মাধ্যমিকের শেষে আবিরের অন্তরে চারুর বসবাস শুরু হয়। চারুকে ভালোবাসার অনুভব নিজের কাছে ধরা পরে ওর। চারুকে, চারুর সবকিছুকে আবির অধিকার করতে চায় যেন। তবে অনুক্ত থেকে যায় সব।

বিকেলের দিকে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে অস্ত যাবে সূর্য। চারিদিকে পাখির কলরবে পরিবেশ ঝেকে বসেছে যেন।
'আমার প্রেমের মালা আমি করবো কারে দান। আমার প্রেমের মালা আমি করবো কারে দান।' আবির গানটি গুণগুণ করতে করতে যাচ্ছিল। পায়ের নিচে শুকনো পাতা মড়মড় করে ভাঙ্গছে। চারুদের বাগানের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ও। কামরাঙা গাছের নীচু একটা ডালে বসে কামরাঙা খাচ্ছিল চারু। আবিরকে দেখতে পেয়ে, 'কিরে, প্রেমের মালা দান করতে কোথায় যাস?'
আবির প্রথমে চমকে উঠে উপরে তাকিয়ে চারুকে দেখতে পেল। আমতা আমতা করে বলল, 'না মানে, এদিক দিয়ে মাঠে যাচ্ছিলাম।'
'এই, তুই কোন ক্লাসে পড়িস?'

'নাইনে, কেন?'
'তুই প্রেমের কি বুঝিস রে? দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন!'
চারুর এ রকম কথায় আবির বেশ লজ্জা পেল। ও দ্রুত পা চালাতেই চারু ডাকল, 'কামরাঙা খাবি?'
'না, যাই।'
'খাবি না কেন? দাঁড়া দিচ্ছি।'
চারু গাছ থেকে দুটি কামরাঙা আবিরের দিকে ছুঁড়ে মারল, 'এই নে ধর।'
একটা কামরাঙ্গা আবিরের মাথায় আর একটা নাকে এসে লাগল সজোরে। হালকা ব্যথাও পেল ও। কামরাঙা দুটি কুড়িয়ে নিয়ে আবির প্রায় ছুটে চলল ওখান থেকে, 'আমি যাই।'
পিছন থেকে চারুর হাসির শব্দ কানে এলো। চারু বুঝত আবিরের ঘুরঘুর করার কারণ। চারু ভাবত, কিশোর বয়স এরকম একটু হবেই। স্রেফ বন্ধুর মত ছাড়া আবিরকে আর কিছুই ভাবত না ও।

এক বিকালে আবির চারুদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। ওকে দেখতে পেয়ে বাড়ির ভিতর ডাকল চারু, 'এই আবির, শোন।'
আবির ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তার পাশের সুপারি বাগান চিরে অদূরে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চারুকে দেখতে পেল। চারু হাতের ইশারায় ওকে ডাকছে। আবির চলল চারুর দিকে। চারু আজ লাল বেনারশী একটা শাড়ি পরেছে। শাড়ির আঁচল কোমরের ডান পাশ দিয়ে উঠে এসে বাম বক্ষ অতিক্রম করে নিচের দিকে চলেছে। মাথার মাঝখানে সিঁথি করে খোলা চুলগুলো ডান বক্ষের উপর। ডান কানে একটা রঙ্গন ফুল সগৌরবে আরোহণ করছে। আবির কাছে এসে তাকিয়ে থাকল একনাগাড়ে অবোলভাবে।
'কিরে অমন হাবার মত কি দেখছিস?' চারুর কথায় আবির সম্বিত ফিরে পেল।
'না, কিছু না।'
'কেমন দেখাচ্ছে আমাকে?'
'সত্যি করে বলব?'
'তবে কি আমি মিথ্যা শুনতে চেয়েছি? বদমাইশ।'
'তোমাকে একদম বউ বউ লাগছে।'
'বউ বউ লাগছে মানে, কার বউ?'
'তাতো বলা যাবে না।' বলেই স্থান ত্যাগ করতে আবির দ্রুত পা ফেলল।
'এই দাঁড়া, তবেরে...।'
পিছন থেকে হাসির শব্দ পেয়ে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করল ওর কিন্তু লজ্জার জন্য তাকাতে চাইল না। আবিরের চিন্তা হলো, থাকুক না লজ্জা। এই লালিত্য দৃশ্য তো আর সব সময় পাওয়া যায় না। আবির লালসাহীন চোখে চারুর দিকে তাকালো। আবির দেখছে হাসির তোড়ে চারু নুয়ে পড়ছে, চোখের পাতা কাঁপছে হাসির দমকায়। আবিরের কাছে চারু এক লাস্যময়ী নারী। এই লীলাবতী নারীর জন্য আবিরের ভালোবাসা যেন বৃষ্টির ন্যায় ঝরে।

সন্ধ্যার আগে চারুদের পুকুর পাড়ে বসে গল্পগুজব করেণ ওর মা, চাচীসহ আশপাশ বাড়ির অন্য মহিলারা। পুরুষেরা তখন ঘরে থাকে না। এরকমই এক গোধূলী লগনে আবির চারুদের ঘরে ঢুকল চুপিচুপি একটা কিছু চুরির উদ্দেশ্যে। আবির চারুর রুমে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক তখনই শুনতে পেল চারু ওর রুমে বসে গান গাইছে,

'আধো রাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, মনে পড়ে মোরে প্রিয়,
চাঁদ হয়ে রবো আকাশের গায়, বাতায়ন খুলে দিও।'

আবির আর সামনে এগোতে পারল না। দেয়ালে হেলান দিয়ে গান শুনতে থাকল। এক সময় গান থেমে গেল। আবির ঘোরের মধ্যে ছিল। অনেকক্ষণ গানের শব্দ শুনতে না পেয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল ওর সামনে চারু দাঁড়ানো। আবির লজ্জা, ভয়ে মাথা নিচু করে থাকল। ক্ষণিকের জন্য কথা হল না।
'চারদিকে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে, মা ঘরে আসবে এখন। এবার যা।'
আবির একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার মাথা নিচু করে চলে গেল চারুর সামনে থেকে। চারু ভাবল আবিরের এসবের মানে কি? অবশ্য বুঝতেও পেরেছে কিন্তু সমাজ-বাস্তবতা ও বয়সের ব্যবধানের জন্য চারু চুপ থাকল।

গভীর রাতে আবির পড়ার টেবিলে বসে আছে। ডান হাতে একটা ছবি। ঐ ছবিটায় এক তনয়া শাড়ী পড়ে বসে আছে কোলের উপর হাত রেখে। এটা চারুর ছবি। এই ছবিটা আবির সেদিন চুরি করতে গিয়েও পারে নাই। কিন্তু আজ তার অভিযান সফল হয়েছে। আবিরের হাতের নিচে একটা কাগজ। যেটাতে একটা কবিতা লেখ। ক্লাস সেভেন থেকে কবিতা লেখে আবির। হাতের নিচের কবিতাটির নাম 'আমার মিতার এ ছবিখানি'।

আমার মিতার এ ছবিখানি,
চোখের কাছে বারে বারে টেনে আনি।
পরানের সবটুকুতে সে যে আছে, তাহা আমি জানি।
কিন্তু হায়,
সে কাছে নাই
তাইতো আমার চোখে পানি।
সে ছবিতে আমি দেখি,
টানা টানা চোখে তাহার নেই কোন পলক।
মাথায় দীঘল কৃষ্ণকালো অলক।
গোলাপ রঙের ঠোঁটে, মিষ্টি একখানি হাসি
তাকে যে আমি বড় ভালোবাসি।
কনকের চুড়ি হাতে তার,
গলায় তাহার সোনার হার
খোঁপায় তাহার বেলী ফুলের মালা,
সে আমার মিতা, এ পল্লীবালা।
ওহে, ললনা
অমন করে আর না তাকিয়ে থেকে
বল না কথা একটুখানি হেসে।
হৃদয়ে ব্যথার শুচি, কেন আমায় দাও
হোক না ছবি,
কও না কথা তবে একটু কও।

৩

ফজরের আজানের শব্দে আবিরের চিন্তা ভঙ্গ হল। আবির মোবাইলের আলো জ্বেলে দেখল পাঁচটা বাজে। ও বিছানা ছেড়ে ওযু করতে গেল।

প্রচন্ড ঠান্ডা, তাড়াতাড়ি করে লেপের ভিতর দেহটাকে রাখল আবির। সকাল সাতটার কিছু পরে হাফিজের ডাকে আবিরে ঘুম ভাঙ্গল, 'আবির ওঠ, এই আবির ওঠ।'

আবির অনেক কষ্টে চোখ খুলে উঠে বসল। চোখ মেলে তাকাতে পারছে না যেন। চোখ খুলল ও, 'কি হয়েছে?'

'বারে, কয়টা বাজে। রেডি হয়ে ব্রেকফাস্টে যেতে হবে। তারপর যে যার কাজে।'

ডাইনিং হলে একটা টেবিলে খাচ্ছে আবির, হাফিজ, মারিয়া আর নাইম। মারিয়া বলছে, 'মাঝে একটা রাত গেল তারপরও বিষণ্ণ। কেন এই বিষণ্ণতা?'

'আর বল না, ওর ভাব যাবে না।' নাইমের উক্তি।

'আমিতো কোন ভাবে নাই।' ওদের উদ্দেশ্যে আবির বলল।

শুধু হাফিজ কোন কথা বলল না।

ব্রেকফাস্টের পরে রেস্ট হাউজকে পিছনে ফেলে ওরা যাচ্ছে কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা দিয়ে দক্ষিণের দিকে। কালকের সেই মণিপুর গ্রামে। ওদের সাথে যোগ দিয়েছে আরও অনেককে। সবাই হাঁটছে আর কথা বলছে একে অপরের সাথে। পরস্পরভাবে ক্যামেরা ক্লিকের শব্দ হচ্ছে। রাস্তার পাশের মানুষজন তাকিয়ে ওদের দেখছে অধীর আগ্রহে। ওদের থেকে একটু দূরে হাঁটছে আবির। জলপাই রঙের খাদি জামার উপরে নকশা করা সাদা শাল, প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে ও।

নতুন জায়গায় সবার ভিতরে উচ্ছ্বাস বইছে। এসব উচ্ছ্বাস আবিরকে স্পর্শ করতে পারছে না যেন। মাঝে মাঝে মারিয়া, নাইম থমকে দাঁড়িয়েছে আবিরের জন্য কিন্তু সে তো বহু দূরে, চলছে সে কচ্ছপের গতিতে।

শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশনে এসে ওরা একটি গ্রুপ ছবি তুলতে চাইল, কিন্তু আবিরকে পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর এক সিনিয়র ভাই ওকে ডেকে নিয়ে এলো, 'স্যার আপনার জন্য অপেক্ষা আছি, আসেন, আসেন।'

ওরা স্টেশনের ওভার ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ফটো তুলল। রেল লাইন অতিক্রম করল দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের বগির মাঝ দিয়ে। এপারে এসে রিকশায় চাপল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

বিকেলে সবাই লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে গেল। উদ্যানের বিশালতার ভিতর ঢুকে আবির ছন্নছাড়ার মত ঘুরছে। ওর বন্ধুরা ওকে পেল না শত খুঁজেও। একা একা ঘুরছে ও। বিরহীত মনে বিশাল বনের মাঝে ও হারিয়ে যেতে চাইল কিন্তু পারল না। কিসের যেন একটা টান অনুভব করল ও। সন্ধ্যায় সবার সাথে মিলিত হল আবির। যেখানে গেছে সবখানে আবির যেন একা। পরদিন মাধবপুর লেকে গিয়েছিল ওরা, সেখানেও। ফেরার দিন মাধবকুন্ড জলপ্রপাতে। সবখানে আবির একা থেকেছে, কারও সঙ্গ নেয়নি। জলপ্রপাতের পানি পতনের শব্দ হচ্ছে অনেক জোড়ে। এরকম পানি ঝরে আবিরের চোখ থেকেও। এই জলপ্রপাতের সাথে পার্থক্য শুধু, এখানে শব্দ হয়। আবিরের চোখে পানি পতনের শব্দ হয় না।

৪

রাত আটটার দিকে আবির রেস্ট হাউজের রুমে বসে চিন্তা করছে চৌরাস্তায় যাবে কি যাবে না। আজও চারু বলেছে ঐখানে যেতে। আবির ভাবছে যাবে না। বিবেক এই সিদ্ধান্তে সাড়া দিয়েছে চরমভাবে। কিন্তু মন বলছে যেতে। আবির দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ল। শেষ পর্যন্ত আবির উঠল যাবার উদ্দেশ্যে। এখানে মনের কাছে বিবেক পদাবনত হল। আবির ব্যাগের ভিতর থেকে চারুর সেই ছবিটি বের করে চোখের সামনে ধরে রাখল মুহূর্তের জন্য। তারপর ছবিটি জামার পকেটে রাখল ও। চারুকে চিরদিনের জন্য ছবিটা ফেরত দিবে আজ। আবির রুমে তালা দিয়ে ঘুরতেই নাইম, হাফিজের সাথে দেখা।

'কিরে, কই যাস?'

আবির কোন কথা না বলে রুমের চাবি ওদেরকে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। ওরা মামুনের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। রাস্তায় প্রচুর কুয়াশা গা ঘেষে উড়ে যাচ্ছে। এ রকম কুয়াশার সান্নিধ্য সব সময় পাওয়া যায় না। আবির দ্রুত গতিতে হাঁটল চৌরাস্তার দিকে। ঠিক সময়, ঠিক জায়গায় পৌঁছল ও। আবির হাঁপাচ্ছে, অনেক জোরে এসেছে ও। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাসের সাথে ধোঁয়া বের হচ্ছে। শীতের এ রাতে নিস্তব্ধ চারপাশ। পাশ দিয়ে একটা কুকুর যাবার সময় ওকে চেয়ে দেখল একটু। আবির ওর ডান হাত দিয়ে বুকের বামপাশে জামার ভিতরের পকেট থেকে ছবিটি বের করল। বুকের তাপে ছবিটিতে হালকা উষ্ণতা অনুভব করল ও। ছবিতে চারুর মুখে এক চিলতে হাসি যেন বাস্তবে দেখতে পেল।

এই জায়গায় আবির দাঁড়িয়ে আছে প্রায় এক ঘন্টা হল। হাত ঘড়ির কাটাগুলো রেডিয়াম মাথায় নিয়ে ঘুরছে। কি হলো, চারু কি আসবে না আজ? কি হল ওর। ওর কি মনে আছে আসার কথা। আবির পকেটে থেকে সেল ফোনটি বের করে চারুর নাম্বারে ডায়াল করে পরক্ষণেই কেটে দিল। চারু তো অন্তত একটা ফোন করতে পারত। কি হবে ওকে ফোন করে। ও চারুর কে? চারু কেন ওর জন্য এই শীতের রাতে কুয়াশার ভিতর বেরিয়ে আসবে? আবির একটা হাসি ছাড়ল, উপহাসের হাসি। ও ভাবল কোন অধিকারে এসেছে চারুর ডাকে। চারুতো ওর কেউ না। চারু তো এখন অন্য জগতের মানুষ। আবিরকে তো না ডাকলেই পারত ও। চারু এখন মরীচিকা ছাড়া কিছুই না।

আবির হাত থেকে ছবিটি ছুড়ে ফেলতে গিয়েও পারল না। হাতের সাথে কেমন যেন লেগে আছে ওটা। আবিরের চোখ থেকে শ্রাবণের বিনা মেঘের গর্জনে বৃষ্টির মত ঝরছে বারিধারা। কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যায় না। ধীরে ধীরে কুয়াশা ঢেকে নিল আবিরকে।

মধ্যরাত। ১৭ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। ৩৯৭ কবি আহসান হাবীব সড়ক, পিরোজপুর।

আসমত আলীর অনশন

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে একটা ব্যানার টাঙ্গানো। ব্যানারে কালো কালিতে লেখা, 'সরকার ও বিরোধীদলের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে আমরণ অনশন কর্মসূচী।' চারদিকে মানুষ গিজ গিজ করছে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে এমনটির অপেক্ষায় আছে সবাই। মানুষের চাপে মেডিকেলের রাস্তা বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

ব্যানারের কয়েকহাত সামনে দাঁড়িয়ে মাইকে বক্তব্য রাখছেন আসমত আলী, –'আমার সামনে উপস্থিত সাংবাদিক ভাইয়েরা, মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিকসহ সকলকে আমার ব্যথিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে সালাম জানাচ্ছি। শোকে স্তব্ধ হয়েও আজ আমি এখানে এসেছি। শোক প্রকাশের ভাষা আমার জানা নাই। আজ আমি নিঃস্ব। এই দুনিয়ায় আমার আমি ছাড়া কিছুই নাই। আপনারা জানেন গত দশ দিন আগে সারা বাংলায় দেশ বাঁচাও পার্টির ডাকে হরতাল পালিত হয়েছিল। আর এই হরতাল ঠেকাতে সর্বশক্তি দিয়েছিল সরকার দল 'বাঁচাও দেশ পার্টি'। বিরোধীদল হরতাল করবে আর সরকার দলীয়ভাবে হরতাল ঠেকাবে। কিন্তু মাঝে পড়ে আমরা সাধারণ মানুষ নিঃস্ব হই।

হরতালের প্রথম দিন সকালে আমার স্ত্রীর প্রচন্ড প্রসব ব্যথা হয়েছিল। তখন সকাল নয়টা। ওকে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্সের দরকার ছিল। ফোন করেছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স কপালে জোটে নাই। অনেক দৌড়ঝাপ করার পর একটা সিএনজি জোগাড় করেছিলাম। সিএনজিতে করে স্ত্রীকে নিয়ে আমি হাসপাতালের দিকে রওনা হলাম। ছেলের বউয়ের কষ্টকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমার মা সঙ্গে এসেছিলেন। যখন বড় রাস্তায় উঠলাম তখন হরতাল পালনকারী আর হরতাল বিরোধীদের মধ্যে শুরু হল সংঘর্ষ আর ভাংচুর। আমাদেরকে আর এগোতে দেয়া হল না। আমি হরতালের পক্ষের নেতাকর্মীদের নিকট হাত জোড় করে বলেছিলাম, 'আমার স্ত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক আমাকে গাড়ি নিয়ে যেতে দিন।'

তারা কেউ আমার কথা শুনল না। এর মাঝ থেকে কেউ একজন বলল, 'হরতাল সফল করুন, জনতার কাতারে আসুন।' তারা আমার কথা শুনল না। আমি সরকার দলের কর্মীদের কাছে গিয়েছিলাম তারাও আমার কথা শুনতে চায়নি। তারা বিরোধীদের ঠেকাতে ব্যস্ত ছিল। আমি ছুটেছিলাম আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের কাছে। তারাও টিয়ারশেল, রাবার বুলেট আর জলকামান নিয়ে ব্যস্ত ছিল। আমি ব্যর্থ হয়ে সিএনজির কাছে এসে দেখি, সিএনজিটি ভাংচুর করে উল্টো করে ফেলে রাখা। পাশে পুত্রবধুর মাথা কোলে নিয়ে মা বসে আছেন। আমি দেখলাম আমার স্ত্রী আর বেঁচে নেই, সে চলে গেছে আমার সন্তানকে পেটের ভিতর নিয়ে। এর দুই ঘন্টা পর আমার মা শোকের ধাক্কায় মারা যান। আমি এখন শুধুই একা।'

আসমত আলী কাঁদতে লাগলেন হাউমাউ করে। তার সাথে কাঁদতে বাদ গেল না উপস্থিত কেউ। আসমত আলী কাঁদছেন, কাঁদছে সবাই।

আসমত আলী আবার বলতে শুরু করলেন, 'সপ্তাহ খানেক বাদে কর্মস্থলে গেলে তারা জানায় আমার চাকরি নাই, ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারিনি বলে। সাত দিন অনুপস্থিত ছিলাম। বিএ পাশ করে এক প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার অপারেটরের চাকরি নিয়েছিলাম। ছয় বছর এই পেশায় ছিলাম। আমি আর ওদের এসব বলিনি। বলে কি হবে! আমাদের নেতারাই বুঝলো না, তারপর তো ওরা! আমি গিয়েছিলাম আমাদের দেশের মানবাধিকার কমিশনের কাছে, তারা কিছু বলল না। বুঝলাম কমিশনের কলকাঠি অন্যখান থেকে নাড়ানো হয়।'

আসমত আলী একটু থামলেন, কেউ কিছু বললো না। তিনি আবার শুরু করলেন, 'একবার ভাবুন তো এই হরতাল দেয় বিরোধীদল আর হরতাল প্রতিহত করে সরকারী দল। আবার সরকারী দল যখন বিরোধীদলে যায় তখন তারাও হরতাল দেয়। আমি হরতাল চাই না একথা বলবো না, কিন্তু মানুষের ক্ষতি করে! আপনারা হরতালের ডাক দিন ঠিক আছে। তবে হরতাল পালন করা, না করা জনগণের ব্যাপার। সারাজীবনের কষ্টের টাকা দিয়ে মানুষ গাড়ি কেনে, মিল চালায় আর তা আপনারা ভেঙ্গে ফেলেন। আগুন দেন। আপনাদের লজ্জা করে না? ঐগুলো তো আপনাদের পারিবারিক সম্পদ নয়। আমার টাকা নাই। আমি সামান্য বেতনের কর্মচারী ছিলাম। যদি সরকারী দল বা বিরোধীদলের কেউ অসুস্থ হতেন তাহলে শত হরতালের মাঝেও তারা হাসপাতালে যেতেন। কারণ তাদের ক্ষমতা আছে, টাকা আছে। তাহলে এদেশ কি শুধু তাদের? এরপর আর এদেশের আইনের উপর আস্থা থাকবে কীভাবে!

অপরাধীও ছাড়া পায় ক্ষমতা আর টাকার জোরে। এর জন্যই কি ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল? লক্ষ লক্ষ মা-বোন তাদের অমূল্য ইজ্জত দিয়েছিল? আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি সাতচল্লিশ বছর হল। এত কিছুর বিনিময়ে আমরা কি পেয়েছি? যে দেশ নিয়ে গর্বের শেষ নাই সে দেশের নেতাদের এ অবস্থা কেন? বলুন, জবাব দিন।'

উপস্থিত কেউ আসমত আলীর কথার জবাব দিল না। তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি এখানে বিচার চাওয়ার জন্য দাঁড়াইনি। আমি বিচার চাই আদালতের কাছে। আমি আল্লাহকে বলি, আল্লাহ আমি ধৈর্য্য ধরেছি, তুমি সাক্ষী থেকো। আমি এখানে এসেছি সরকার ও বিরোধীদলের কাছে জবাব চাইতে। এর দ্বায় কে নেবে? কেন এমন হল? আর এর জবাব দিতে তারা বাধ্য। কারণ তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যতক্ষণ না সরকার প্রধান আর বিরোধী দলের প্রধান একসাথে এই জায়গায় এসে জবাব না দেবেন, দেশবাসীর কাছে এ জন্য ক্ষমা না চাইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ জায়গা ছাড়ব না। আমার এই অনশন চলবে সেই পর্যন্ত। আমি মরণকে ভয় পাই না। কারণ বাঁচার স্বাদ আমার নাই। অনেকে অনেক কথা বলেন যে, একটা মহল আমাকে দিয়ে এ কাজ করাচ্ছে। আমি এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। যাই বলা হোক না কেন, আপনারা এর দ্বায় এড়াতে পারবেন না।'

এরপর এক এক করে তিন দিন কেটে গেলে। তবে শহিদ মিনার প্রাঙ্গনে আসমত আলী রয়ে গেলেন। দুপুরের কড়া রোদেও শহীদ মিনারে বসে আছেন। তার চোখে ভেসে উঠে স্ত্রীর মলিন মুখ। মৃত্যুর সময়ও স্ত্রীর সাথে কথা বলতে পারেননি। এসময়ে স্ত্রীর পাশে না থাকার বেদনা যে কত কঠিন। তদুপায় মায়ের মৃত্যু তাকে আরো বিচলিত করে দেয়। সে দিন অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন উনি। ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ের চিৎকার শুনতে পেল, 'আসমত, আসমত। জলদি আয়।'
মায়ের ডাক শুনে উনি দৌঁড়ে গেলেন ঘরের ভিতরে। গিয়ে দেখেন ওনার স্ত্রী পেটে হাত দিয়ে চিৎকার করছে। প্রচন্ড ব্যথা করছে পেটে। উনি তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স আনতে গিয়ে না পেয়ে একটা সিএনজি আনলেন।

'এই ভাই তাড়াতাড়ি চল।'
সিএনজি চালক প্রথমে আসতে চায়নি। তারপর হরতাল বলে বেশি ভাড়া দাবি করে আসে। আসমত সিএনজিতে করে স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হলেন হাসপাতালের দিকে। সিএনজির পিছনের সিটে তারা তিনজন। স্ত্রী যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে। আসমত স্ত্রীর হাত ধরে পাশে বসে আাছে। ও ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছে, 'তাড়াতাড়ি যাও।'
ও স্ত্রীকে বলছে, 'এইতো হাসপাতালের কাছাকাছি এসেছি আমরা। তোমার কিচ্ছু হবে না। একটু সহ্য কর।'
আসমতের মা মলিন মুখে পুত্র বধুর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। হঠাৎ সিএনজি থেমে গেল। আসমত আলী জিজ্ঞাসা করল ড্রাইভারকে, 'থামলে কেন?'
'ঐ যে দেখেন পিকিটিং হইতাছে। যামু কেমনে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এগিয়ে আসছেন আসমত আলীর দিকে। কাছে আসলে আসমত আলী তাকে কিছু বললেন না। বসে থাকলেন চুপচাপ। মন্ত্রী আসমত আলীর পাশে বসলেন, 'তোমার সাথে সংহতি প্রকাশ করতে আসলাম।'
'আমার দাবিতো সংহতি প্রকাশের জন্য ছিল না, আমার দাবিতো আপনাদের অজানা নয়।'
'আহা তোমার সাথে একটা সমঝোতা করতে হবে তো।'
'কিসের সমঝোতা? আমি দাবি আদায় ছাড়া এক পাও নড়ব না। আর কত প্রাণ নিবেন আপনারা। আপনার সাথে তো আমার কথা বললে হবে না। আপনার নেতা ছাড়া কারও সাথে আমি কথা বলব না।'

এরপর মন্ত্রী ওনার উপর বেজার হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় কোন অশুভ পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিলেন। তারপর বিরোধী দল থেকে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ নেতা এলেও আসমত তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার এক কথা দুই দলের প্রধান নেতা ছাড়া কারও সাথে কথা নয়। ঐদিন রাত আটটায় আসমত আলীকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে গেল। আটকের তিন ঘন্টা পর পুলিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে এই খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথে দেশে বিদেশের বিভিন্ন মিডিয়া, মানবধিকার সংস্থার চাপে আসমত আলীকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

আসমত আলীর এই অনড় অবস্থান সাড়া দেশে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল। এখন প্রতিদিনকার সংবাদ আসমত আলীকে ঘিরে। আসমত আলীর এই আন্দোলন এখন পত্রিকা, টিভি, রেডিওতে আলোচনার বিষয়বস্তু। সরকার ও বিরোধীদলের কাছে একসাথে একই দাবি যেন বহিঃবিশ্বের উৎসাহ বাড়িয়ে দিল। সরকার ও বিরোধী দল উভয়ই বহিঃবিশ্বের কাছে ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছে। আর দেশের ভিতর আসমত আলীর আমরণ অনশন মানুষের বিবেককে যেন সজাগ করে দিল।

অনশনের পঞ্চম দিন বিকেলে আসমত আলীর অনশন স্থলে এলেন সরকার ও বিরোধী দলের নেতারা। তারা বলেন, 'আসমত, আপনার দাবির কাছে আমরা পরাজিত। আমরা এক সাথে এসেছি। আপনার দাবি আমাদের সামনে পেশ করুন।'

নেতাদের পেয়ে আসমত আলী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। শোক যেন বেড়ে গেল। উনি চিৎকার দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। আসমত আলীর কান্নার সাথে সরকার প্রধান ও বিরোধী দলের নেতার চোখেও পানি দেখা গেল।

রাতের প্রথম প্রহর। ৪ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ভালোবাসার লাল জামা

ডান পাশের গরুটা হাঁটতে চায় না। ফারুখ বাঁশের কাঞ্চি দিয়ে গরুটার পিঠে আঘাত করল দুই তিন বার। 'হুরুট ঠায় ঠায়।'

কিন্তু গরুটা কয়েক পা গিয়ে আবার থেমে যায়। ফারুখ আবারও গরু দুটাকে হাঁটাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ওর হাটু পর্যন্ত কাদা লেগেছে। গরু দুটোকে জোয়াল থেকে ছেড়ে মাঠের কিনারে নিয়ে যায়। মাঠের পাশে সুযোগ পেয়ে ঘাস খেতে শুরু করে গরু দুইটা। ফারুখ আইলের উপর বসে কোমরের গামছা খুলে মুখের ঘাম মুছে। মাঠে মেঘের ছায়া রাজত্ব করছে, ফারুখ আকাশের দিকে তাকাল। এক নাগারে খানিক তাকাতেই বাবার কথা মনে পড়ল ওর।

প্রায় আট বছর হল ওর বাবা ছমিরউদ্দিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং সেই সাথে সংসারের বোঝাটা দিয়ে গেছেন ফারুখের মাথায়। ছমিরউদ্দিন এ মাঠে, এ জমিতেই চাষাবাদ করে দিন গুজরান করত। ফারুখ আজ বাবার স্থান উত্তারাধিকার সূত্রে লাভ করেছে। এক অগ্রহায়ণের ভর দুপুরে সাপের কামড়ে প্রাণ হারান ছমিরউদ্দিন। ক্ষেত জুড়ে পাকা ধান কাটছিলেন ছমির, ঠিক এমন সময় পাশের ক্ষেতের আইলারা তার ছটফটানি দেখে ছুটে আসে। অবচেতন অবস্থায় পায় তাকে। বা পায়ের গোড়ালির একটু ওপরে দুইটা দাঁতের তিক্ষ্ণ আঁচড় দেখা গেল। ওরা হাতে হাতে ধরে ছমিরকে বাড়িতে নিয়ে এল। ওঝাকে খবর দেয়া হল।

চারদিকে মানুষের জটলা। মাঝখানে ওঝা ছমিরউদ্দিনকে সামনে নিয়ে চেষ্টা-তদবির করছে। কতকক্ষণ পর ওঝা বলল, 'এডা দারাইশ সাপের কামড়, এর বিষ মুই নামাইতে পারমু না। এহোন আল্লারে বোলান। মোর ধারে এর তদবির নাই।' তারও কিছুক্ষণ পর ছমিরের মুখ থেকে সাদা ফেনা বের হল। থেমে থেমে রক্ত বমি করল কিছুক্ষণ। তারপর একদম নিথর হল ছমিরউদ্দিনের দেহ। ফারুখ স্কুল থেকে ফিরছিল তখন। বাড়ির সামনে থেকেই কান্নার শব্দ শুনে আর মানুষের ভীড় দেখে আতঙ্কিত হয়ে বাড়ির রাস্তা ধরল ও। সামনে এসাহাক চাচাকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চাচা, বাড়িতে এত লোক ক্য, কি অইছে?'

'তোর বাজানরে সাপে কামড় দিছে।' উর্ধ্বশ্বাসে উত্তর দিলেন তিনি।

ফারুখ জটলার ভিতর চলে এল এক দৌড়ে। উঠানের মধ্যখানে ওর বাবার দেহ চিত হয়ে আছে, আর তারই একটু দূরে ওর মা দু হাত ঝাপটিয়ে আহাজারি করছেন। আশে-পাশের বাড়ির কয়েকজন চাচি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ফারুখ বাপের মাথার কাছে বসে দুই হাটুর মাঝে মাথা গুজে কেঁদেছিল, চিৎকার করে। ফারুখ এখন ঠিক তেমন ভঙ্গিতে বসে আছে আইলের উপর। জলিলের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে ও মুখ তুলে তাকাল।

'ও ফারুখ মিয়া, দিন যে ফুরাইয়া গেল। বাড়ি যাবা না?' ফারুখ চোখ মুছে দেখল জলিল এতক্ষণে বাড়ি যাবার জন্য জোগাড় হয়েছে। ও উত্তর দিল, 'হয়, যামু। তুমি এ্যটটু খাড়াও।'

ওরা বাড়িতে আসতে আসতে দিনের আলো নিভে গেছে। পাখির কলরব তখনও দেধারছে শোনা গেল। গরুগুলো মহাজনের গোয়াল ঘরে বেঁধে রেখে বাড়ির সামনের খালে নেমে কয়েকটা ডুবে গোসল করে নিল ফারুখ। ভেজা অবস্থায় ঘরের সামনে গিয়ে মাকে ডাকল, 'মা লঙ্গিডা দেও দেহি।' ওর মা একটা লুঙ্গি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। লুঙ্গি পড়ে গামছা দিয়ে গায়ের পানি মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, সায়মা কই?'

'পিছের ঘরে। আইজ হারা দিন কাঁনছে।'

'ক্য কি অইছে, কাঁনছে ক্য?'

'ঐ বাড়ির রেশমা লাল জামা আর জোতা কেনছে ঈদের লাইগগা। আমার ধারে সায়মা জামা আর জোতা চাইছে।'

সায়মা ক্লাস টুতে পড়ে। গত বছর উত্তর পাড়া প্রাইমারি স্কুলে ওকে ভর্তি করে দিয়েছে ফারুখ। নিজের কলিজাই যেন সায়মা রুপে বিচরণ করছে সর্বত্র। ফারুখ ঘরে ঢুকে পিছনের বারান্দায় এসে দেখল সায়মা তখনও খাটের এক কোনে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। একটা হারিকেন মিট মিট করে জ্বলছে, গোটা ঘর মৃদু আলোয় ভরে গেছে। ফারুখ সায়মার পাশে বসে একটু শব্দ করেই হাসল। হাসির শব্দ পেয়ে সায়মা মুখ তুলে তাকিয়ে আবার বালিশে মুখ গুজে আগের মতই কাঁদতে লাগল।

'বোনডি তোর লাল জামা আর জোতা লাগবে?'

'হয় লাগবে।' সায়মা মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল।

'আইচ্ছা দিমুআনে। শিগগিরি দিমু। এহোন আর কাঁনদিস না।' নিমিষেই সায়মা কাঁদার কথা ভুলে গিয়ে উঠে বসল।

'হুরুট ঠায় ঠায়।' ডান হাতে লাঙ্গল আর বা হতে একটা গরুর লেজ ধরে ফারুখ জোয়ালের গরু দুটোকে তাড়া দিচ্ছে। লাঙ্গলের আঘাতে খন্ডিত মাটির দিকে তাকিয়ে গরুগুলোর পিছনে হাঁটছে ও। পাশের ক্ষেতের জালালকে লক্ষ্য করে ফারুখ বলল, 'বোজ্জ জালাল ভাই, মহাজনের কাছ দিয়া হাজার খানেক টাহা কর্জ নেললাম, হেই টাহা এহোনও দিতে পারি নাই। এক দিনে পাই ত্রিশ টাহা দিমু ক্যমনে।'

'মোরা গরিব, বোঝলা ফারুখ মিয়া, মোগো দিন যে ক্যমনে যায় হেয়া মোরা জানি আর জানে মোগো আল্লায়।' জালাল একটু পরেই উত্তর দিল। ফারুখ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বোইনডায় লাল জামা আর জোতা চাইছে। শ' তিনেক টাহা তো লাগবেই। মায়রেও একখান শাড়ি দেতে চাই এই ঈদে। কি হরমু কও দেহি।'

'মাহাজনের থ্যাইক্কা আরও পাঁচশ টাহা লও। তয় যে চাড়ালের চাড়াল, মোডেও দেবে যে তা মনে অয় না।'

'মুইও চিন্তা হরছি। আইজ সন্ধ্যায় মাহাজনের ধারে যামু। আর তিন দিন পরইতো ঈদ।'

'তুই আবার কোন মুহে টাহা চাইস। তোর ধারে এহোনও তো ম্যালা টাহা পাই।'

'চাচা, মোরে আর কয়ডা টাহা দেন। মুই কাম কইরগা শোধ দিয়া দিমুআনে।' কাতর নয়নে মহাজনকে বলল ফারুখ। চেহারায় রাজ্যের আকুতি।

'আচ্ছা, কদেহি তুই টাহা দিয়া হরবি কি?'

'মোর বোইনডা জামা আর জোতার লইগগা জম্মের মত কাঁনছে। আর এই ঈদে মায়রেও একখান শাড়ি দিমু।' মহাজন মুখে ভেংচি কেটে বলল, 'খয়রাতির আবার শখ কত। যা আমার সামনে দিয়া।'

খয়রাতি বলে গালি দেওয়ার ফারুখ মনে খুব কষ্ট পেয়েছে। ওখান থেকে মাথা নিচু করে চলে এল। ওর চোখে যেন বাঁধ ভাঙ্গা নোনা পানির ধারা বইছে। ও চিন্তা করছে মহাজানের তো অনেক টাকা। কয়েক টাকা ধার দিলে তো এমন কোন ক্ষতি তো হত না। কিন্তু তা না দিয়ে উল্টো তাকে খয়রাতি বলল। টাকার জন্য মহাজনের মত লোকেরা ওদেরকে মানুষ বলে মনে করে না। অন্ধকার রাস্তায় ফারুখ হাঁটছে খুবই ধীরে পা ফেলে। একমাত্র বোনের আবদার, জামা আর এক জোড়া জুতা। ভালোবাসার ছোট্ট বোনের আবদার কি ও পূরণ করতে পারবে না। রাস্তা দিয়ে জালাল যাচ্ছিল হাতে হারিকেন নিয়ে। হারিকেন উঁচু করে ফারুখকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কই গেছিলা মিয়া।'

'মাহাজনের কাছে টাহা চাইতে। দেয় নাই, খেদাইয়া দেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জালাল বলল, 'ওই সব বদমাইসদের ক্য যে আল্লায় এত টাহা দিছে। আচ্ছা হোন মিয়া, গঞ্জে যে সাদেক সাব আছে না? ঐ যে বিদেশে থাহে। হুনছি উনি নাকি পরশু যাকাতের জামা-কাফুর দেবে। লও ঐহান দিয়া মোরা লইয়া আমু আনে।'

খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ফারুখ জালালকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন সময় যাবা। আমিও যামু তোমার লগে।'

'বেশি দেরি অইলে পামু না। কাইলই সন্ধ্যায় যামু। তুমি জোগাড় অইয়া থাইক্ক।'

'আচ্ছ, ঠিক আছে।'

ফারুখ বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করছে, ছোট বোনকে জামা আর জুতা দিতে পারলে বোনটি অনেক খুশি হবে। ও এতটুকুতেই অনেক খুশি হবে। বোনের খুশির কথা চিন্তা করতেই ফারুখের চোখ জুড়ে আবারও পানি এল। বাবা মারা যাবার পর লেখা-পড়া হয় নাই ওর। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়া হয়েছিল। বাবা মারা যাবার পর যেটুকু জমি ছিল তা মহাজন দখল নিয়েছে। ছমিরউদ্দিন নাকি জমি বন্ধক রেখে মহাজনের কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নিয়েছিলেন। ধারের টাকা শোধও হয় নাই আর জমিও ফেরত হয় নাই। ফারুখের পরিবার অনিশ্চয়তার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল বারে বারে। এই অনিশ্চয়তার ভিতরই ফারুখ লাঙ্গলের হাতল ধরল, জমি-জমা নেই বলে ও হল পাক্কা এক বর্গা চাষি। পরিবারে ও ই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি, দিন আনে দিন খায়. কষ্ট-ক্লেশে কোন মতে চলে যায় ওদের পরিবার।

ঘরের মেঝেতে একটা কেরসিনের বাতি জ্বলছে মিট মিট আলোর জ্যোতি ছড়িয়ে। বাতাসের তালে তালে দুলছে আগুনের শিখা। জালাল উঠানে দাঁড়িয়ে গলা খাকরি দিল।

'ফারুখ মিয়া বাড়ি আছ নাকি। ও ফারুখ মিয়া।'

'কেডা জালাল ভাই। খাড়াও আইতে লাগজি।' ঘরের ভিতর থেকে ফারুখ উচ্চস্বরে উত্তর করল। ফারুখ ঘর থেকে বের হয়ে এল। জালাল ফারুখকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি মিয়া যাবা না?'

'আমি তো জোগার অইয়া তোমার লইগ্গা বইয়া রইছি, জালাল ভাই।'

'তয় লও, সন্ধ্যা অইছে ম্যালা সময়।'

'এ্যটটু খাড়াও, মার ধারে কইয়া আই।'

সন্ধ্যার পর রাত করে ওরা গঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হল। কাল সাদেক সাহেব যাকাতের কাপড় দিবে বলে ওরা আগে ভাগেই চলল গঞ্জের দিকে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে ফারুখ আর জলিল। শুধু রাস্তার পাশে জোনাকি পোকা জ্বলছে আর নিভছে। নিরবতা ভেঙ্গে জলিল ফারুখকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বয়স তো ম্যালা অইল। এবার একটা বিয়া কর মিয়া।'

'বিয়া, কি যে কও জালাল ভাই। নিজেরাই খাইতে পারি না। বউরে খাওয়ামু কি?'

'আরে খাওয়ার কতা চিন্তা কর ক্য। আল্লায় এ্যটটা ব্যবস্থা হরবে।'

এরকমই অর্থক, নিরর্থক কথা বলা-বলি করে মাঝ রাতে ওরা গঞ্জে এসে পৌছল। সাদেক সাহেবের বাড়ির সামনের মাঠে ওরা অন্ধকারে গাছের গোড়ায় বসে রাত কাটাবে বলে ভাবছে। ফারুখ ওর পায়ে শব্দ করে একটা চড় মারল। মুখে বিরক্তি আর প্রতিবাদের ছাপ নিয়ে স্বগোতক্তি করল, 'হালার মাশার লাইগগা এ্যটটু বইতেও পারমু না। ফাঁক পাইলেই খালি কামড়ায়।' জালাল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাঁন তো পশ্চিম দিকে ঝোলছে। রাইত আর বেশি নাই মিয়া। আর এ্যটটু বও।'

ভোরের আলো ফুটতেই ঐ মাঠে অনেক মানুষের সমাগম হল। সবাই ওদের মতই যাকাতের কাপড় নিতে এসেছে। এর মধ্যে সবাই কি প্রতীক্ষিত যাকাতের কাপড় পাবে, এর কোন নিশ্চয়তা তারা পায় নাই তবে কাপড় পাওয়ার জন্য সবাই প্রাণপণ চেষ্ট চালিয়ে যাবে মনে হচ্ছে। ওদের কাছে না বড় যাকাত, না অন্য কিছু। সবাই এসেছে একটা কাপড় পাবার প্রত্যাশায়। ওদের মধ্যে ফারুখের মত অনেককে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফারুখ আর জালাল বাড়ির দিকে ফিরে আসছে। জালালের হাতে একটা লুঙ্গি আর শাড়ি আর ফারুখের হাতে একটা লাল ফ্রক ও একটা শাড়ি। ঠিক হাতে নয় বুকের সাথে ঠেসে ধরে আছে। জোরে জোরে পা ফেলছে ওরা। চোখ লাল, সারা রাতের কষ্ট ওদের বিষিয়ে তুলেছে। বাড়িতে গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। জালাল বলল, 'আইজ আর কামে যামু না। তুমিও যাইও না। দিনের তো ম্যালা সময় শেষ অইয়া গেছে।'

'মুই যামু না জালাল ভাই। আইজ শরিরডা তো ভাল নাই। কিন্তু ঘরে যে সদায় পাতি নাই। চাউলও নাই।'

'ঠিক আছে তুমি মোর লগে মোর বাড়ি লও। চাউল দিমু আনে কেজি দুই। মোর ঘরে চাউল আছে।' অতি আগ্রহে জালাল বলল। জালালের ঘরের বারান্ধায় খাটের উপর ফারুখ বসে আছে। ওর হাতে পলিথিনের একটা ব্যাগে চাল। ও ব্যাগটা নিয়ে উঠতে চাইল। জালাল বলল, 'আরে মিয়া বও বও। এটটু জিরাইয়া লও।'

'না এককালে বাড়ি যাইয়া জিরামুআনে। এহোন যাই।' জালাল বলল, 'বিয়ালে আঢের দিকে আইও কিন্তু।'

ফারুখ বাড়ির কাছা-কাছি এসে গেছে প্রায়। সামনের মোড়টা ঘুরলেই ওদের বাড়ির উঠোন দেখা যাবে। ফারুখ মোড় ঘুরে বাড়ির রাস্তা ধরে হাঁটছে। বাড়ির উঠোনে অনেক মানুষের জটলা দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। পরক্ষণেই আবার জোরে জোরে পা ফেলে চলল উঠানের দিকে। উঠানে আসতেই ঘরের ভিতর থেকে ওর মায়ের কান্না শুনতে পেল। ও ঘরে ঢুকে পিছনের বারান্ধায় চলে এল। বারান্ধার খাটে সোজা করে সায়মাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। ওর সারা শরীর একটা কাপড়ে ঢাকা। পাশে বসে ওদের মা চিৎকার করে কাঁদছে। বিস্ফোরিত নয়নে ফারুখ জিজ্ঞাসা করল, 'কি অইছে?' ওখানেই দাঁড়িয়েছিল ধলা চাচি। তিনি বললেন, 'দাসত অইছিল শ্যষ রাতে। লগে রক্ত বমিও অইছিল সায়মার। এহোন পরানডা আর ধরের লগে নাই।'

এই সেই খাট যেখানে বসেই সায়মা লাল জামার আবদার করেছিল ফারুখের কাছে। ও ঘরের মেঝেতে বসে আছে মাথায় হাত দিয়ে। পাশে পলিথিন ছিড়ে পড়ে আছে চালগুলো। তারই এক হাত দূরে পড়ে আছে শাড়ি আর লাল ফ্রকটি। ফারুখ কান্না করছে না শব্দ করে। ও কেমন যেন মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে গোড়া কাটা গছের মত।

রাতের শেষ ভাগ। ৭ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। কুমিল্লা

সততার অলঙ্কার

'হ্যালো, মনোয়ার সাহেব। কি খবর? ভালো আছেন তো?'
'জ্বী স্যার।'
'শুনলাম, আপনি নাকি ইরফান নামের একটা ছেলেকে গ্রেফতার করেছেন।'
'জ্বী স্যার ওর নামে ধর্ষণের মামলা হয়েছে।'
'জানেন তো, ও আমার ভাইয়ের ছেলে।'
'তবে স্যার, ওর বিপরীতে যিনি মামলা করেছেন তিনি কিন্তু মেয়েটির বাবা হন।'
'মনোয়ার সাহেব, আপনি অনেক অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন। আপনি ভুলে যাবেন না যে, আপনি সরকারী এক কর্মচারী আর আমি সরকারের একজন নেতা। আমার পদবী মনে হয় আপনাকে বলতে হবে না। আগামী ৬ ঘণ্টার মধ্যে ওকে ছেড়ে দেবেন। না হলে আমি আপনার এমন অবস্থা করবো যে, আর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারবেন না।' ওপাশ থেকে ফোনটি রেখে দিল। মনোয়ার ধীরে ধীরে কান থেকে ফোনটি নামিয়ে রাখল। মন্ত্রীর ফোন ছিল। মনোয়ার চিন্তা করছে এ রকম আর কতকাল চলবে। মন্ত্রী যে নির্দেশ দিবেন তা পালন করতে হবে। অনৈতিক হলেও। এরকম বিষয়ের প্রতি ওর এত ঘৃণা ও ক্ষোভ জন্মাল যে, তা যদি পানির মত সাগরে রাখা যেত তাহলে সেটা বঙ্গপোসাগরের চেয়েও বড় সাগর পর্যন্ত ছেয়ে যেত। ওর চোখে ভেসে ওঠে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা এক কিশোরীর মুখ। নরপশু ইরফান মেয়েটির শ্রেষ্ঠ সম্পদ লুটে নিয়েছে।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে মেয়েটি সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চোখ দিয়ে পানি ঝরছে নিরব স্রোতের মত। মা মরা মেয়ের পাশে বসে মৃদু শব্দ করে কাঁদছিল মেয়েটির বাবা। মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ বেড়ে যেত। খবর পেয়ে মনোয়ার গিয়েছিল মেয়েটিকে দেখতে। মনোয়ারকে দেখে মেয়েটির বাবার কান্না যেন আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, 'আমার শেষ ইজ্জটুকুও লইয়্যা গেল, স্যার আমি কেমনে বাঁচুম।'
মনোয়ার লোকটির ঘাড়ে হাত রাখল, 'ধৈর্য্য ধরুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'
লোকটি যেন রেগে গেল মনোয়ারের এই কথায়।
'ধৈর্য্য ধরুম, কি ঠিক হবে সাব? মা মরা মাইয়াডার আর কি বা আছে? সব আমার কপাল সাব। সব কপাল।'
কান্নার জন্য সব কথা বলতে পারছে না যেন, লোকটি বলতে শুরু করল আবার।
'থানায় গেছিলাম কিন্তু তহন আপনারা কইছেন, ভয় নাই। মন্ত্রীর লোক দেইখ্যা কিছু করেন নাই তহন। আর এহন আইছেন ধৈর্যের কথা কইতে।'
মুহূর্তের জন্য মুর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল মনোয়ার। কিছুক্ষণ পর মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল ও। মেয়েটি মনোয়ারকে দেখে চোখ নামাল।
'আমাকে বলো বোন। ভয় পেও না। আমার উপর আস্থা রাখ। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যে তোমার এই অবস্থা করছে তাদেরকে আমি এর উপযুক্ত শাস্তির দরজায় নিয়ে যাব।'
মেয়েটি অনেক্ষণ কোন কথা বলল না। ও মনোয়ারের দিকে চোখ তুলে তাকাল, যেন একটা ভরসা খুঁজছিল। মনোয়ার আবার বলল, 'বল, নির্ভয়ে বল সব।'

মেয়েটি বলতে শুরু করলে মনোয়ার অফিসারকে ডাকল, 'Officer come here, write everything what she says.'
মেয়েটি কলেজে যাচ্ছিল প্রতিদিনের মত। পশ্চিমের গলিতে আসতেই পথ রোধ করল ইরফান ও তার এক চেলা। শুধু সেদিন নয় প্রতিদিনই ওরা মেয়েটিকে নানা রকম হয়রানি করত। ইরফান কোন কথা না বলে মেয়েটিকে ধরে টানাটানি করতে লাগলো পাশের নির্মণাধীন একটা ভবনের দিকে, 'চল, চল কোন কথা কইবি না। একদম জানে মাইরুম।'
মেয়েটি চিৎকার করতেই ওর মুখ চেপে ধরল, 'চোপ কোন কথা কইবি না। চিৎকার করস ক্যান। আজকা তোর তেজ দেইখ্যা ছাড়ুম।'
ইরফানের চেলা বলল, 'ম্যালা বাড় বাড়ছে মাগি। ওস্তাদ ওরে এভাবে টানাটানি করলে মানুষে দেইখ্যা ফালাইব। ওরে তুইলা চলো তাড়াতাড়ি। আইজকা ওর ঝাল মিটাই।'

ওরা মেয়েটিকে পাশের নির্মাণাধীন ভবনটায় নিয়ে গেল। এখানে ওরা খুবলে খুবলে মেয়েটির ইজ্জত লুট করল, পালাক্রমে। একবার নয়, দুইবার নয় বহুবার। মেয়েটি অনেক চিৎকার করেছিল। তবে তার চিৎকার সভ্য সমাজের কোন মানুষের কানে আঘাত করে নাই। ও চিৎকার করেছিল শেষ পর্যন্ত। নরুপশুদের হাত থেকে বাঁচার অনেক চেষ্টা করেছিল নিরস্ত্র মেয়েটি। তবে ওর শক্তি এই অসুরদের কাছে পরাজয় বরণ করল।

এই জানোয়ারদের ঘৃণ্য স্পর্শে মেয়েটির কলেজের সাদা ইউনিফর্ম মুহূর্তেই লাল হয়েছিল। এক সময় মেয়েটি তার চেতনা হারিয়ে নিস্তেজ হলে আহত দেহটিকে ফেলে চলে গেল ওরা।

মনোয়ার টলমল চোখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওয়াসরুমে গিয়ে চোখেমুখে পানি দিয়ে আবারো টেবিলে বসল। ওর মাথা থেকে হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা অসহায় মেয়েটার চেহারা যেতেই চাইছে না যেন। ও চিন্তা করছে অপরাধী যতই ক্ষমতাধর হোক না কেন তাকে তার অপরাধের সাজা পেতেই হবে। মেয়েটিকে যে, ও কথা দিয়েছে। মনোয়ার থানায় ফোন করল। কিছুক্ষণ ফোনটি ও কানে ধরে রেখে বলল, 'অফিসার, ইরফানকে আমার নির্দেশ ছাড়া কোনভাবেই ছেড়ে দিবেন না। কথাটা মনে থাকে যেন।'

মনোয়ার ফোনটি কান থেকে নামিয়ে রাখল। ওর রুমের পর্দা ঠেলে ড্রাইভার হাজির, 'স্যার, বাসায় যাবেন না।'

'কটা বাজ এখন?'

'সাড়ে আটটা, স্যার।'

'ও আচ্ছা, জীপ বের কর। আমি আসছি।'

মনোয়ার নারায়ণগঞ্জ সদর সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার। একই পদবীতে মনোয়ার আজ দশ বছর কাজ করে যাচ্ছে। নিজের দায়িত্ব পালন করে খুবই নিষ্ঠার সাথে। নৈতিকতার বিরুদ্ধে কখনও কাজ করে নাই। এই দশ বছরে ওকে সতেরবার বিভিন্ন জায়গায় বদলি করা হয়েছে। অনেকবার জীবনের ঝুঁকিতেও পড়তে হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুতেই দমে যায় নাই মনোয়ার। স্ত্রী ইভা মনোয়ার ও চার বছরের মেয়ে সাদিয়াকে নিয়ে মনোয়ারের ছোট্ট সংসার। উচ্চ শিক্ষিত তবে স্বভাবে-চলনে একদম পল্লীবালা ইভা নিষ্ঠায় একদম স্বামীর মতন। মনোয়ারের সততায় অনেকটা ইভার ভাগ আছে যেন। কারণ ইভা সব সময় ওকে সততার উপর দেখতে চায়। সংসার শুরুর ঠিক চার বছর বাদে সাদিয়ার আগমন।

গাড়ি গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান গেট খুলে দিয়ে সাবকে স্যালুট দিল। গাড়ীর শব্দ পেয়েই ইভা দোতলার জানালার পর্দা ফাঁক করে নিচের দিকে তাকিয়ে মনোয়ারকে গাড়ি থেকে নামতে দেখলো। খুব দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল। মনোয়ার ডোর বেল টিপতে যাবে ঠিক সে সময়ই ইভা দরজা খুলে দিল। মনোয়ার ঠোঁটের কোনে এক ঈষ্যৎ হাসি দিল।

মনোয়ার দোতলার বারান্দায় বসে আছে একটা বেতের চেয়ারে। অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা হয়েছে। চারপাশে ঘন অন্ধকার। মনোয়ারের বুকে মুখ ডুবিয়ে গায়ের সাথে লেপ্টে আছে সাদিয়া। মেয়েটা বাপ পাগল। তবে বাপকে তেমন একটা কাছে পায় না। কি মনে করে ছোট্ট এই মেয়েটি মুখ তুলে বলল, 'জানো বাবা, আমার খরগোস দুটি কত সুন্দর খেলতে পারে।'

'তাই নাকি। কবে থেকে?'

'কবে থেকে আবার, আজ থেকে। চল তোমাকে দেখাই।' মেয়েটি কোল থেকে নেমে বাপের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

রাত দশটা। খাওয়া শেষে ইভা সাদিয়াকে ঘুম পাড়াচ্ছে। মনোয়ার ডেস্কটপে কাজ করছে। ঠিক এই সময়ে রুমের ল্যান্ডফোনটি বেজে উঠলো। মনোয়ার ফোনটি কানে তুলল, 'হ্যাল, আসসালামুআলাইকুম।'

'মনোয়ার সাহেব আপনাকে মন্ত্রী মহোদয় বলার পরও ইরফানকে ছেড়ে দেননি কেন?'

'স্যার ওর নামে ধর্ষণের মামলাসহ সাতটি চাঁদাবাজীর মামলা ও তিনটি জিডি আছে।'

'ঠিক আছে, কতজনের নামেই তো এরকম মামলা থাকে। আরে অফিসার এসবের চিন্তা করলে তো আর চলা যাবে না। ওকে ছেড়ে দিন।'

'স্যার, ওর নামে যথাযথ ওয়ারেন্ট নিয়েই গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছি।'

'তাতে কি? আবার ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেই তো হয়। কাগজে ওকে পলাতক দেখান। ব্যস সব চুকে গেল।'

`No sir, I can't do it. You are misguiding me which is wrong. Sorry sir.'

'You know, I am senior to you. I am commanding you to do it, that's it.'

‘Yes sir I know everything. But it is true that he is a fornicator.’
‘যা বললাম আপনি তা করুন।’
‘স্যার ঐ নির্যাতিত মেয়েটি যদি আপনার মেয়ে হত তাহলে কি পারতেন এরকম কথা বলতে।’
‘Officer you are living in an imaginative world.’
‘যাই হোক স্যার আমি এ কাজ করতে পারব না।’
‘আপনি কিন্তু আমার নির্দেশ অমান্য করছেন।’
‘তাই বলে আমি আপনার একটা অনৈতিক নির্দেশ তো মানতে পারি না স্যার। তবে স্যার, আপনি যদি কোন লিখিত নির্দেশ দেন তবে চেষ্টা করতে পারি।’
‘আপনার মত এই পুছকি junior officer এর কাছ থেকে আমার শিখতে হবে না।’ ওপাশ থেকে ফোন রাখার শব্দ হলো।
ইভা জিজ্ঞাসা করল, ‘কার ফোন?’
‘ডি.আই.জি সাহেবের।’
‘কি বললেন উনি?’
‘অবৈধ নির্দেশনা দিলেন। আর কি কাজ।’
‘এখন কি করবে তাহলে?’
‘কি আর করব। যেটা সত্য সেটাই করব। দেশের নামে শপথ করেছিলাম, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করবো। আমার এই শপথ তো বৃথা হতে পারে না।’
‘কিন্তু উনি তো অনেক ক্ষমতার অধিকারী, তোমার সিনিয়র কর্মকর্তা।’
‘তাই বলে অন্যায় করতে পারি না। এক মেয়ের সম্মান নষ্টকারী অপরাধীর হয়ে কাজ করলে আমিও যে অপরাধী হয়ে যাব।’
মনোয়ারের গলা ভারি হয়ে এল, চোখ ছলছল করছে ওর। স্বামীর এ অবস্থা দেখে ইভা আর কথা বলতে পারল না।

আকাশের ঠিক মধ্যখানটিতে চাঁদ ভাসছে। রাত এখন শেষের দিকে। চাঁদের আলোয় চারপাশের অন্ধকার কেমন মলিন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বড় মেঘের খন্ড চাঁদকে ঢেকে দিলে পৃথিবীটাকে যেন অন্ধকার গ্রাস করে ফেলে। মনোয়ার দোতালায় খোলা বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। ও পড়ে আছে ওর প্রিয় একটি আরামদায়ক পোষাক লুঙ্গি আর গোল গলার গেঞ্জি। ও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন ফাল্গুন শেষ প্রায়। ওর গায়ে ফাল্গুনের বাতাস জড়িয়ে যাচ্ছে আলতোভাবে। বারান্দা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ফুল গাছ থেকে নতুন বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। এরই মাঝে বেলি ফুলের গন্ধ ওর নাকে এসে লাগল। ও অবাক হয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে রেলিং এর পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকল। এখন তো বেলি ফুলের গন্ধ পাওয়ার কথা নয়। বেলি ওর প্রিয় ফুল। ছেলেবেলায় কত যে এই ফুলের সাথে ওর সখ্যতা ঘটেছে। ঘরের সামনে ওর একটা ফুলের বাগানে বেলি ফুলের অগ্রাধিকার ছিলো। ও সব সময় অপেক্ষা থাকতো কখন ঐ গাছে সাদা ফুল গন্ধ ছড়াবে। ভরা চাঁদনি রাতে বর্ষা ওর প্রিয় ছিলো বলে বর্ষার জন্য অপেক্ষায় থাকত। বৃষ্টি হলেই বেলীফুল গাছটার কাছে যেত। বৃষ্টিভেজা ফুল আজল ভরে ও নাকের কাছে নিয়ে চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিত। কলেজের পড়ার সময় কোন এক রাতে বেলি ফুলের সান্নিধ্যে এসে একটা কবিতা লিখেছিল। তার কয়েকটি লাইন ওর আজও মনে আছে,

‘আমি দু হাত ভরে বর্ষা ভেজা বেলী ফুল নিয়ে
কারও জন্য দাঁড়িয়ে আছি রাতের এই নিরবতায়
সেকি আসবে, নাকি আসবে না।
তা আমি এখনও জানি না।
যে আসবে, তাকে আমার চেনাই হল না
তাইতো শেষ হয় না আমার অপেক্ষা।’

ওর মনে এই বসন্তের নিস্তব্ধ রাতে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে। ওর মনে হল ছেলেবেলায় কতই না শান্তি ছিল। কোন চিন্তা ছিল না। আর এখন ওর কাঁধে কত দায়িত্ব। ঐ সময় যে কত হারিয়ে যাওয়া হতো সারাদিনের প্রতিটি মুহূর্তে। দক্ষিণবঙ্গের ছেলে হওয়ায় কাদা, পানি এসবের সাথে মনোয়ারের বন্ধুত্ব ছিল অনেক। এই যে এখন বসন্ত চলছে, এই সময়ে মধ্য দুপুরে খালি পায়ে মাঠে ঘুড়ি নিয়ে ছুটাছুটি করত। ঘুড়ি বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে লাটাই ধরে নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকত। সকালে ঘর থেকে বের হতো। ফিরত একদম সাঁঝের বেলাতে। এর জন্য মায়ের অনেক বকা খেলেও পরদিন আর এসব মনে থাকতো না। সে দিনগুলোর কথা মনে হতেই মনোয়ারের নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বেরিয়ে এল–

'আমার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে,
ফেলে আসা দিনগুলোয়-
যে সবের মাঝে এখনও ভালোবাসা জড়িয়ে আছে।'

মনোয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। ঘাড়ে কারো হাতের স্পর্শ পেয়ে পিছনে তাকিয়ে ইভাকে দেখতে পেল। মনোয়ারের ছলছল চোখে বেদনার কান্না দেখল ইভা, 'কি হয়েছে তোমার?"

'না কিছু হয় নাই।'

'আমাকে না বলে কি তুমি থাকতে পারবে?' স্ত্রীর এমন প্রশ্নে মনোয়ারের হৃদয়াবেগ যেন দুমড়েমুচড়ে কান্নায় রূপ নিল। ক্ষণিকের জন্য স্বামী-স্ত্রীর বাহুবদ্ধ আবেগ জড়িত পরিবেশের সৃষ্টি হল। যে বাহুবন্ধন পুরুষের সব বিষাদ-বেদনা ভুলাতে যোগ্যতা রাখে। মনোয়ারের বিষাদগুলো হালকা হলে বলল, 'আজ আটটি বছর তুমি আমার সাথে। তোমাকে দেওয়ার মত দিতে পারিনি কিছুই।'

কাতর নয়নে ইভা জিজ্ঞাসা করল, 'এ কথা বলছ কেন?'

একটু সময় চুপ থেকে মনোয়ার বলতে লাগল, 'ইচ্ছে ছিল সরাসরি দেশের সেবায় অংশ নিব। অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায্যতার জন্য লড়াই করব। লড়াই করতে এসে আমিই আজ অবিচারের কষাঘাতে জর্জরিত। সামান্য বেতন, সাদিয়ার অনেক আবদার রাখতে পারি না অনেক সময় আর তোমার ...।'

ইভা কথা শেষ করতে দিল না, 'তোমার সততাই আমার জন্য বড় অলংকার। আমি সত্যিই অনেক ভাগ্যবতী তোমার মত জীবন সঙ্গি পেয়ে।'

মনোয়ার ইউনিফর্ম পড়ে বের হচ্ছে অফিসের উদ্দেশ্যে। তখন সকাল সাড়ে নয়টা বাজে। মনোয়ার ঘরের সামনে রাখা পাজেরোতে উঠতেই ড্রাইভার গাড়ি র্স্টাট দিল। ইভা আর সাদিয়া দরজায় দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানাল। মনোয়ার গাড়ির গ্লাস থেকে মাথা বের করে হাস্যোজ্জ্বাল চোখে বিদায় নিল। গাড়ি গেট পেরিয়ে রাস্তায় উঠে গেল। ইভা আর সাদিয়ার চোখ আর গাড়িটির দেখা পেল না। দারোয়ান গেট লাগিয়ে দিল।

মনোয়ার কাজে মগ্ন ছিল। ওর রুমের পর্দা ঠেলে মুখ বের করে অফিসের কম্পিউটার অপারেটর বলল, 'আসবো স্যার?'

মনোয়ার মুখ তুলে ওকে দেখে বলল , 'আস, আস।'

কম্পিউটার অপারেটর মনোয়ারের কাছে একটা কাগজ দিল।

'স্যার এই মাত্র এটি ফ্যাক্স এর মাধ্যমে হেড কোয়াটার থেকে পাঠান হয়েছে।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

মনোয়ার কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে দেখল যে, এটি হেড কোয়াটারের জরুরী আদেশ। অতিরিক্ত আইজিপির স্বাক্ষর সম্বলিত এই আদেশে বলা হয়েছে, মনোয়ারকে আগামী ১৬ ঘণ্টার মধ্যে বান্দরবান সদর সার্কেলে জয়েন্ট করতে। ওকে বান্দরবন বদলি করা হয়েছে। মনোয়ার অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এই নিয়ে ওকে ১৮ বার বদলি করা হল। তারপরও ঠান্ডা মাথায় হেড অফিসে ফোন করে Additional IGP মাসুদ হাসানকে চাইল। মাসুদ হাসান ফোন ধরলে মনোয়ার কথা বলা শুরু করল, 'আসসালামুআলাইকুম, স্যার আমি নারায়ণগঞ্জ র্সাকেল এএসপি মনোয়ার হোসেন।'

'ও মনোয়ার, বল।'

'স্যার একটু আগে আপনার একটা লিখিত আদেশ পেয়েছি। আপনি জানেন যে কেন আমি ফোন করেছি?'

'মনোয়ার তোমার কথা স্পষ্ট নয়। আমি বুঝতে পারছি না।'

'স্যার আমার কথা স্পষ্ট নয়। নাকি আপনাদের কাজ অস্পষ্ট।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'স্যার আমাকে হঠাৎ জরুরীভাবে বান্দরবন বদলি করা হয়েছে। তাও আবার ১৬ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়ে। কিন্তু স্যার আমি জানলাম না আমার অপরাধ কি? আমাকে এই ১০ বছরে ১৮ বার বদলী করা হয়েছে, এর চেয়ে আমার সততার আর কি পুরস্কার হতে পারে! 'Please sir, tell me, what is my fault? Please sir, answer my question, please.'

'যা করা হয়েছে তা উপরের নির্দেশে করা হয়েছে। এর বেশি তোমাকে আর কিছু বলতে পারব না।'

AIGP ফোন রেখে দিলেন। মনোয়ার ফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে থাকল। ও চিন্তা করছে কি হল এসব। পরক্ষণে আবার মনে করল ও তো এসব জেনেই করছে একাজ।

ধীরে ধীরে ও স্বাভাবিক হয়ে ভাবছে এরকম আর কতকাল চলবে। কোন কাজ শুরু করলে শেষ করতে পারলেও সব কিছু মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু কোন কাজ শুরু করলে তা আর শেষ করতে দেওয়া হয় না। তা হলে এ সততা নিয়ে আর কি হবে। ও চিন্তা

করছে এই গোলামি চাকরি থেকে অবসর নিবে। রিজাইন দিবে। পরক্ষণেই চিন্তা করল তাহলে কি ও হেরে যাবে এই অসত্যের কাছে। না তা হতে দেওয়া যাবে না।

মনোয়ার দুপুর দুইটার দিকে অফিস থেকে বের হল। অফিস ভবন থেকে গেট পেরিয়ে আসার আগেই ড্রাইভার আসল,
'স্যার গাড়ি বের করব?'
'না থাক, তুমি যাও।'
মনোয়ার গেট পেড়িয়ে যেতেই ওর দেহরক্ষী এসে হাজির।
'স্যার কোথায় যাবেন?'
'তুমি আমার সাথে আসবে না।'
'কিন্তু আপনার সাথে থাকা যে আমার ডিউটি।'
'ঠিক আছে, তোমাকে আমি ডিউটি থেকে অব্যহতি দিলাম, এবার যাও।'
দেহরক্ষী আর এগোতে পারল না। মনোয়ার রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছে নিরবে। আশেপাশে কোথাও না তাকিয়ে। ও দীর্ঘ নয় মাস এই শহরের শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করছে। এ অল্প সময়ে এই শহরকে ভালোবেসে ফেলেছে ও। সব সময় গাড়িতে করে চলার কারণে ভালো করে দেখা হয় নাই কিছুই। আজ রাতেই মনোয়ারকে এই শহর ছেড়ে যেতে হবে। বহুদিন রিকশায় চলা হয় নাই তাই রিকশায় করে বাসায় আসতে চাইল ও। এক রিকশাওয়ালাকে ডাক দিল, 'এই রিকশা দাঁড়াও।'

মনোয়ারের দেহরক্ষী অফিসে বসে চিন্তা করছে। কি করা উচিত এখন। স্যারকে একা যেতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। স্যারের জীবন রক্ষার জন্যই সরকার ওকে নিয়োগ দিয়েছে। তাছাড়া স্যারের কিছু হলে কি জবাব দিবে, এই নয় মাসে স্যারকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছে ও। মনোয়ারের মত অফিসার ও সাত বছরের চাকুরী জীবনে দেখে নাই। দেহরক্ষী দ্রুত অফিস থেকে একটা মটরসাইকেল বের করে মনোয়ার যে পথে হেঁটেছে সে পথে গেল।
মনোয়ার রিকসায় করে বাসার দিকে যাচ্ছে। রিকসাওয়ালা রিকসাটি খুবই জোড়ে জোড়ে চালাচ্ছিল। মনোয়ার ওকে বলল, 'এত তাড়া কেন আস্তে চালাও ভাই।'

মনোয়ার কতক্ষণ আকাশের দিকে আবার কতক্ষণ চারপাশটা দেখছে। মনোয়ার লক্ষ্য করল বিপরীত দিত থেকে একটা মটরসাইকেল দ্রুত গতিতে আসছে। চোখ বাদে আরোহীর মুখ কাল টুপিতে ঢাকা। মটরসাইকেলটি মনোয়ারের কাছে এসে কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা রিভলবার দিয়ে মনোয়ারকে শুট করল। গুলিটা মনোয়ারের বাম হাতের গোড়ায় লাগল। হঠাৎ প্রচন্ড ব্যাথায় ও রিকসা থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ল। ধীরে ধীরে মনোয়ারের চোখ বন্ধ হয়ে এল।

এর ঘন্টা সাতেক পর মনোয়ার হাসপাতালের কেবিনের বেডে শুয়ে চোখ মেলল। ও চোখ মেলে দেখল ইভা আর সাদিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে ওর উপর ঝুকে আছে। মনোয়ার ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিল। হঠাৎ হুড়মুড় করে কেবিনে একদল সাংবাদিক প্রবেশ করল। ক্যামেরায় ছবি তোলার শব্দ হতে থাকল বিরতিহীনভাবে। শার্ট, শার্ট, শার্ট...।

মধ্যরাত। ৩ চৈত্র, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

উঠোনে ঘোলা পানি জমেছে

১

বৃষ্টির পানি টিনের উপর মাদকতার ঝঙ্কারে স্বতন্ত্র শব্দ তুলছে। শুনতে বড্ড ভালোই লাগছে। আজ সাত দিন হল এক টানা বৃষ্টি হচ্ছে। থামতেই চায় না যেন। বাগানের গাছগুলো ভিজে একদম একসার। একদম কাকভেজা অবস্থা। বৃষ্টির পানি বাগান ধুয়ে পুকুরের পানি ঘোলাটে করছে। ঘোলা পানির মধ্যে তিনটি পাতিহাঁস চড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এদের মধ্যে ছাঁই রঙের হাঁসটি নিজের পাখনার মধ্যে মুখ লুকিয়ে ভাসছে। ওটাকে খুবই বিষণ্ন দেখাচ্ছে। একদম নিষ্প্রাণ, নির্জিব। কিছুদিন আগে প্রিয়জনকে হারিয়েছে ওটা। প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথাওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে খুব।

ঘরের দক্ষিণ পাশের একটা জানালা খুলে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে আফনান। আকাশের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে ও। নাহ্, আকাশের অবস্থা তেমন ভালো দেখাচ্ছে না। পশ্চিম আকাশে এখনও কালো মেঘ আধিপত্য বিস্তার করে আছে। মেঘ তার রাজ্য বিস্তার করতে চাচ্ছে যেন। পুরো কলাখালি গ্রাম মেঘে আচ্ছন্ন। শুধু কলাখালি নয় গোটা পিরোজপুর তারপর গোটা বাংলাদেশ মেঘে ডুবে আছে। সূর্যের দেখা নাই মোটেও। মনে হয় সূর্য পৃথিবীর কথা ভুলে গেছে। এক সময় আফনানের কাছে এই বৃষ্টি তথা বর্ষাকাল খুবই বিরক্ত লাগত। কাদা, কাদাপানি কিন্তু এখন আর লাগে না। ওর প্রিয় মানুষটার পছন্দ এই বর্ষাকাল। বর্ষার সময়টা ওর প্রিয়ার নাকি খুবই পছন্দ। তাই প্রিয় মানুষের প্রিয় সময়কে তো আর অপছন্দ করা যায় না। আফনান এখন বৃষ্টি দেখছে। এ দেখার ভিতর আর বিরক্তভাব একবারে নেই। ও এখন বৃষ্টি দেখে প্রিয় মানুষের চোখ দিয়ে। ওর হৃদয়ে বাসা বাঁধা মানুষটির নাম নুসরাত। এই মানুষটিকে আফনান অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। ওকে ভালোবাসতে গিয়ে আফনানের অন্তরে ভালোবাসা আর অবশিষ্ট নাই। নুসরাত নামটি যেন ভালোবাসায় মোড়ানো। আফনানকে আমি বলতে শুনেছি, দি নেইম ইজ মাই লাইফ। এদিকে নুসরাতের অবস্থাও ব্যতিক্রম কিছু নয়। আমি একদিন নুসরাতকে প্রশ্ন করেছিলাম, আফনানকে ভালোবাসার পরিমাণ। নুসরাত কতক্ষণ চোখ বুঝে থেকে যা শুনালো তার মমার্থ আমি আজও বুঝি নাই হয়ত কোন দিন বুঝতে পারব না।

নদী পাড়ের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নুসরাত ও আফনানের পড়াশুনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশে বয়ে যাওয়া কীর্তনখোলা নদীর তীরে ওদেরকে বসে থাকতে দেখা যেত। হাতে হাত রেখে। আবার প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছে, টিনের চালে শব্দটা আগের চেয়ে বেড়েছে। যে দিন থেকে আফনান জেনেছে বৃষ্টির প্রতি নুসরাতের ভালোলাগার কথা, সে দিন থেকে আফনান স্বপ্ন দেখত বৃষ্টিকে ঘিরে। ও স্বপ্ন দেখত জোছনা রাতে চাঁদের আলোতে চারদিক যখন ভরপুর তখন প্রবল বৃষ্টিতে নুসরাতের হাত ধরে কেয়াবন পথে খালি পায়ে হাঁটবে।

আফনানের মনটা একদম ভালো নেই। ওর হৃদয় আকাশে অনেক বড় একটা কালো মেঘ জায়গা দখল করে আছে। ও ছটফট করছে গলাকাটা মুরগীর মত। কিন্তু ওর কি করার আছে তা নিজেও জানে না। আর কিছুক্ষণ এরকম হতে থাকলে ও পাগল হয়ে যাবে। নুসরাতের সাথে ওর তিন দিন কোনো যোগাযোগ হয় নাই। যার সাথে ওর কথা হতো প্রতি ঘন্টায় তার সাথে আজ তিন দিন যোগাযোগ নাই! মাসুম, জায়েদকে জিজ্ঞাসা করলে ওরা জানাল, তাদের সাথেও কথা হয় নাই প্রায় তিন দিন।

'চিন্তা করিস না আফনান, নুসরাত হয়ত নেটওর্য়াকের বাইরে আছে।' কিন্তু আফনানের মন কোন কথাই মানতে চায় না যেন। রাজশাহী নুসরাতের বাড়িতে গিয়ে ওর খোঁজ নিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব? যে করেই হোক কিছু একটা করতে হবে।

আফনানের ছোট ভাই রাকিব হাতে কাগজ নিয়ে ওর কাছে আসলো। ক্লাস থ্রিতে পড়ে ভাইটা।

'ভাইয়্যা আমাকে কাগজের নৌকা বানিয়ে দে। আমি উঠানের পানিতে ভাসাবো। বৃষ্টিতে অ...নেক পানি জমেছে।'

'আমার এখন ইচ্ছা করছে না। পরে, এখন যা।'

'না এখনই লাগবে, নইলে পানি তো গড়িয়ে যাবে।'

'রাকিব, ভাইটি আমার ইচ্ছে করছে না, পরে তোকে ছইওয়ালা নৌকা বানিয়ে দেব।'

'না, আমাকে এখনই দিতে হবে। দেও, এখনই দেও।'

এই ছেলেটা আসলে কিছু বুঝতে চায় না। যখন যেটা ইচ্ছে হবে তখন সেটা ওর করা চাই। বাধ্য হয়ে আফনান নৌকা বানাতে বসল।

২.

আফনান ও জায়েদ শহরে হাঁটছে। বরিশাল সিটি কর্পোরেশন ভবনের পাশে টাইলস দিয়ে বাঁধানো পুকুর পাড়ে। আজ বিকালে নুসরাতের সাথে ওরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে শহরে এসেছে। শহরে ওদের অবশ্য তেমন কোন কাজ নেই। বাস থেকে নামার সাথে সাথেই মুষলধারে বৃষ্টি। ওরা তিনজন একটা দোকানে দাঁড়ালো। বৃষ্টি এখন কমেছে। এবার নুসরাতের বাসায় যাবার পালা। কিন্তু নুসরাতের যেমন যেতে মন চাচ্ছে না আফনানেরও তেমন ওকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। ওদের এই রোমান্স দেখে জায়েদ বলল, 'আফনান আছরের সময় যায়, তোরা রোমান্স কর আমি কিন্তু গেলাম।'

'এই হাদারাম, দাঁড়া।'

নুসরাত রিকসায় উঠে চলে গেল। চলে যাবার আগে বারবার বৃষ্টিতে ভিজতে না করে গেছে ওদের। কিন্তু না করলে কি হবে, ওরা কাকভেজা হয়েছে। সন্ধ্যার পরেও ওরা সেই পুকুর পাড়ে। আফনানের ফোন বাজছে। 'হ্যালো, কে বলছেন?'

'আমি মিসেস ফজলে আফনান।

'ও আচ্ছা আচ্ছা, বলেন।'

'আমার খুব ভালো লাগে, জানো।'

'কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ ভালোলাগার কথা। তো কোন কথা? বলে উদ্ধার করেন।'

'ঐ যে, ঐ কথা।'

'কোন কথা। ভুলে গেছি, আবার বল।'

'ঐ যে মিসেস ফজলে আফনান।' জায়েদ পিঠ চাপড়িয়ে, 'কেয়া ফিলিংস মামা।'

'নাস্তা করেছ?' নুসরাতের জিজ্ঞাসা।

'না করিনি, এইতো করবো।'

'কি বল। এখনও কর নাই। এখনই কর। আমি তোমাকে বিশ মিনিট পর ফোন করছি।'

এই মেয়েটা সব সময় আফনানকে নিয়ে চিন্তা করে। আফনান ঠিক মত খেল কিনা। ঠিক মত পৌঁছল কিনা। কোন সমস্যা হয় নাই তো। চিন্তা যেন কমেই না। জায়েদ প্রায়ই নুসরাতকে দুটি কথা বলে, 'সব কিছু স্বাভাবিকভাবে নেওয়া ও সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকা।' কিন্তু কে শোনে কার কথা।

জায়েদের ফোন বাজছে। মাসুমের ফোন এটা। 'কিরে হাতির বাচ্চা, মোটু। ও রকম ষাড়ের মত ঘুমিয়ে না থেকে আমাদের সাথে আসলেই ভালো হত। তুই আছিস তোর মুরগী স্বভাব নিয়ে, আরেকজন আছে তার ফিলিংস নিয়ে। আমি এখন কোথায় যাই?'

এর ভিতর নুসরাতের সাথে আফনানের আরো অনেকবার কথা হয়েছে। কোথায় আছে, বাস পেয়েছে কি না। কীভাবে যাবে আরো কত কি। হলে পৌঁছার পর খাবার খেয়েছে কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সারাটা রাতের কথা তো পরেই রইল। জায়েদ আর আফনান হলের বারন্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ঠিক সেই সময়টিতে নুসরাতের ফোন এলো, আবার শুরু হল কথা। জায়েদ বলল, 'আমি গেলাম, তুই থাক তোর রোমান্স নিয়ে।'

তারপর কথা হল অনেক অনেক। আর কথার ফুল ঝুড়িতে ক্যাম্পাসের সময় পার করা তো আছেই। অনেক প্রেমিক যুগল দেখা যায়। কিন্তু এরকম যুগল খুবই দুর্লভ। এরকম দিনের ভিতর আবার থাকে অভিমানও, যা ভালোবাসায় ভরপুর। তার ওপর ওরা লেখাপড়ায় অতুলনীয়।

৩

নুসরাত আজ তিন দিন ধরে অসুস্থ। ও যে দিন অসুস্থ হয়, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে নেওয়ার পর ওখান থেকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ওর হার্টে তৎক্ষণাত বড় ধরনের চিকিৎসা প্রয়োজন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর ড. এন. এম. চৌধুরী বোর্ড মিটিংয়ের পর জানালেন, ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসা সম্ভব নয়। তিনি ওকে সিঙ্গাপুরের ই কে হার্ট হসপিটালে হস্তান্তরের কথা বললেন। ওখানের ডাক্তারকে নাকি উনি ইনফর্ম করে রেখেছেন।

নুসরাতকে সিঙ্গাপুরে নেয়া হয়েছিল, চিকিৎসাও হয়েছিল। তবে ও এখন বাড়িতে। বাড়িতে অনেক লোকের ভিড়। সবাই একবারে নির্বাক। কেউ আবার চোখের পানি মুছতে মুছতে বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে। বাড়ির ভিতর থেকে নারী পুরুষের মিশ্রিত কান্না শোনা যাচ্ছে। মাদ্রাসার কয়েকজন ছাত্র বাড়ির একটা ঘরে বসে উচ্চ স্বরে কোরআন পড়ছে। বাড়ির গেইটের ভিতরে একটি অ্যাম্বুলেন্স দেখা যাচ্ছে। ওটার মাথার উপর লাল বাতিটাও জ্বলছে একদম নিরবে। এই গাড়িটির গায়ে লাল কালি দিয়ে লেখা, 'লাশবাহী গাড়ি।'

৪

রাকিবকে নৌকা বানিয়ে দিয়েছে আফনান। নৌকাগুলোকে উঠানে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে ভাসাচ্ছে রাকিব। বৃষ্টি নেই তেমন। হালকা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। আফনান দাঁড়িয়ে আছে দরজার চৌকাঠ ধরে। ওর কয়েক হাত সামনে রাকিব পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছে নৌকার পাশে। আফনানের মাথা ঘুরছে। ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল। ও এসে বিছানায় বসল।

আফনানকে মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে?

'বুকে খুব ব্যথাকরছে।'

'শুয়ে থাক। আমি তেল মালিশ করে দিচ্ছি।'

তিনি তেল আনতে চলে গেলেন। টেবিলের উপর আফনানের সেল ফোনটা বাজছে, খুব জোরে জোরে। ও উঠে গিয়ে ফোনটা রিসিভ করার শক্তি পাচ্ছে না। কিন্তু ফোনটা যেন থামতে চাচ্ছে না। আস্তে আস্তে ও বিছানা থেকে উঠে ফোন কানে দিয়ে বলল, 'হ্যালো আসসালামুআলাইকুম। কে বলছেন?'

'জ্বি আমিই আফনান।'

মিনিট খানেক কানের রাখার পর ফোনটা পড়ে গেল হাত থেকে। আফনানও মেঝেতে পড়ে গেল। কোন কথা শোনা গেল না তারপর। আফনানের মা কোন কিছু পড়ার শব্দ শুনে দৌঁড়ে এলেন।

উঠানে নৌকাগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু রাকিবকে দেখা যাচ্ছে না। কাগজের নৌকাগুলো ঘোলা পানিতে ভাসছে এক দিকে কাত হয়ে। যতটুকু ভাসছে তারচেয়ে দুলছে বেশি। একটা কাল রঙের দাঁড় কাক টিনের চালের উপর দিয়ে উড়ে এসে বসল আফনানদের ঘরের সামনের পেয়ারা গাছের ডালে। কাকটা ভিজে একদম চুপসে গেছে। একটু পরে কাকটা ডেকে উঠলো। কাকটা ডাকছে আর এদিক ওদিক তাকাচ্ছে- 'কা, কা, কা। ডেকেই চলছে এক নাগাড়ে। ওটাকে তাড়াতে কেউ এগিয়ে এলো না।

কয়েকটি রাতের দ্বিপ্রহর। ২৩ আষাঢ়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
পিরোজপুর ও কুমিল্লা।

পিছুটান

‘কিরে কোথায় তুই?’
‘এই তো শাহবাগ।’
‘এক ঘন্টা আগে নীলক্ষেত শুনেছি আর এখন বলছিস শাহবাগ। সত্যি করে বলতো কোথায় তুই?’
‘সত্যিই বললাম তো। খুব ঝামেলা করে আসতে হচ্ছে।’
‘আচ্ছা তাড়াতাড়ি আয়। আমি কাওরান বাজার আছি।’
শাহেদ ফোন কেটে দিয়ে কাগজের অফিসে ঢুকল। শাহেদ ঢাকায় আসলে কাগজের অফিসে আসবেই। কাজ থাকুক বা না থাকুক। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি এই কাগজে রিপোর্টারি করে ও। এছাড়াও কয়েকটি কাগজে ওর লেখা নিয়মিত ছাপা হয়। দুই এক মাস পরপর বিভিন্ন কাজে ঢাকায় আসতে হয়। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে কাগজের অফিসে একটু ঢু মারা। সিনিয়রদের টেবিলে ঘুরে ঘুরে আড্ডা দেওয়া আরও কত কি কাজ। আর বন্ধু রাফসানের সাথে দেখা তো করতেই হবে। সে যত কাজই থাকুক। তা আবার অন্য কোথাও নয়, কাগজের অফিসের নিচে কাওরান বাজারে চায়ের টং দোকানে আড্ডা। কাপের পর কাপ রং চা আর হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের সাথে ওদের আড্ডা বেশ জমে। পত্রিকা পাড়ায় শাহেদের সাথে দেখা করতে রাফসানের ভালই লাগে, বেশ মানানসই আড্ডা হয় ওদের। রাফসান ঢাকায় একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। ওদের পরিচয় হয় এই কাওরান বাজারের কাছে। তখন ওরা ফার্মগেটে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং করত। শাহেদ ও রাফসান ছিল দুই মেরুর দুইজন মানুষ। স্বভাব, চিন্তা-ভাবনা থেকে শুরু করে সব কিছুতে আলাদা ওরা। তারপরও ওদের সর্ম্পকটা ভাল বন্ধুত্বের মাঝে অটুট রয়েছে ছয় বছর ধরে।

অফিসের আট তলায় উপ-সম্পাদকীয় বিভাগে ঢুকতেই সৌরভ জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে দেখা হয় শাহেদের। ওকে দেখতেই তিনি বললেন, ‘কি বড় ভাই, কেমন আছেন?’
শাহেদ মুখ বাঁকিয়ে উত্তর করল, ‘ভাই আবার শুরু করেছেন। বড় ভাই তো আপনি।’ কাগজের অফিসে সব রিপোর্টাররা একে অপরকে ভাই বলে। সে ক্ষেত্রে বয়স যেটাই হোক না কেন সম্পাদক পর্যন্ত সবাই ভাই।
‘ভাই সামনে পেয়ে কত খাতির। আর ফোন করলে পরিচয় দেওয়া লাগে, ফোনের নাম্বারটাই নাই।’ জাহাঙ্গিরকে লক্ষ্য করে কথাটা বলল শাহেদ।
‘কি বল কখন! তোমার নাম্বার থাকবে না। আবার পরিচয় জিজ্ঞাসা করব। আমার তো ঘাড়ে ভাই একটাই মাথা।’
‘এই তো আবার শুরু করেছেন। আমি এখন কোথায় যাই।’
জাহাঙ্গির মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘আপনার মত এত বড় জ্ঞানীর সাথে কথা একটু সাবধানে বলাই ভাল।’
‘উঁহ! খালি বাজে বকেন।’ অস্থিরভাব নিয়ে শাহেদ উঠে আসতে পা বাড়ালো। জাহাঙ্গির সাহেব পিছন থেকে ডাকাডাকি করলেন। শাহেদ না ফিরে হাসতে হাসতে সাত তলায় নামল।

একে একে উল্টা-পাল্টাভাবে পাঁচতলা থেকে বারতলা পর্যন্ত কাগজের বিভিন্ন বিভাগে গেল শাহেদ। রিপোর্টিংয়ের সকল কাজ ও ক্যাম্পাস থেকে করে। প্রশাসনিক কোন কাজ থাকলে অফিসে আসে। এছাড়া কোন কাজ নেই এখানে। তারপরও শাহেদ আসে। অফিসের বিভিন্ন বিভাগের প্রায় শতাধিক লোকজনের সাথে ওর পরিচয় আছে। খাতির আছে খুব। তাদের জন্যই আসে ও। ভাল জানা শোনা ওর।

শাহেদ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় এক ঘন্টা হয়েছে সন্ধ্যা হলো। রাফসান এখনও আসছে না কেন? ফোন বিজি পাওয়া যাচ্ছে। সাত-পাঁচ ভেবে রিপোর্টিং এ ঢুকল শাহেদ। নিজামুল ভাইয়ের ডেস্কের পাশে দাঁড়াতেই নিজামুল ভাই বললেন, ‘ওরে বাপরে আবারও অখাদ্য রিপোর্টার হাজির।’
শাহেদ হেসে বলল, ‘রিপোর্টার আবার অখাদ্য হয় নাকি ভাই?’
‘হয় না। তবে তোমার ক্ষেত্রে হয়।’ বলেই দুইজনে হেসে উঠল। পাশাপাশি ডেস্কে বারেক কায়সার, মাহবুব রনি, কৌশিক ভাই বসেন। ‘কিরে ধান্ধাবাজ শাহেদ। তুই আর কত কামাবি রে।’ শাহেদকে দেখা মাত্রই বলল বারেক কায়সার।
‘কি যে বলেন ভাই। ওসব আপনাদের কাজ।’

সাথে সাথে কৌশিক ভাইয়ের কথা, 'বারেক ভাই কি যে বলেন, কেউ কি আর স্বীকার করে।'
কিছুক্ষণ খেজুরে আলাপের পর মাহবুব রনির টেবিলের পাশে চেয়ার নিয়ে বসল শাহেদ। রনির সাথে এভাবেই ওর কথা হয়। পাশাপাশি বসে ফিস ফিস করে। তারপর একে একে মামুন ভাই, প্রতাপ দা, সিবলি ভাই, মলয় দা, তালেব ভাই, হাদি ভাইসহ কত ভাই ও দাদার সাথে দেখা হয় ওর। শেষে চিফ রিপোর্টার আর সিটি এডিটরের সাথে দেখা করে ও।
'ভাই আসসালামুআলাইকুম।' টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে চিফ রিপোর্টারকে সালাম দিল শাহেদ। চিফ রিপোর্টার আবুল খায়ের না তাকিয়েই, 'কি বল?'
'কেমন আছেন ভাই?'
এবার তাকালেন খায়ের, 'কি বল, এই তো আছি। কাজের কি খবর?'
কথা জিজ্ঞাসা করবেন উনি, অনেক সময়ও দেবেন কিন্তু কথার উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করেন না। এজনের সাথে কথা তো অন্য জনের সাথে কাজ। সামনে বসে কথা বললে মাঝে মধ্যে হুঁ হা করবেন। তবে মানুষটা যথেষ্ট রসিক। কাগজ, টেলিভিশনের সকলেই কেমন যেন রসিক হন।

অফিসের নিচে পূর্ব দিকে কাঁচাবাজারে একটা চায়ের দোকানে চায়ের কাপ সামনে রেখে বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে আছে রাফসান ও শাহেদ। প্রচুর কোলাহল মুখর জায়গাটিতে সবাই কাজে ব্যস্ত। একদিনের বাজার শেষ না হতেই আগামীদিনের বাজারের প্রস্তুতি চলছে। বেশ সরগরম জায়গাটি। দুই ঘন্টা ধরে এখানে বসেছে ওরা। এর মধ্যে বেশ কয়েক কাপ চা খেয়েছে। আর গোটা দশেক সিগারেট খেয়েছে আপাতত। প্রায় ছয় মাস পরে দেখা ওদের। রাত প্রায় দশটা বাজতেই শাহেদ বলল, 'উঠতে হবে রে। নাইলে আবার গেট লাগিয়ে দেবে। তারপর ভাইয়ের ঝাড়িও খেতে হতে পারে।'
'হু, আমিও উঠব।' বলল রাফসান।

রাফসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় আসলো শাহেদ। দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে আবারো রাস্তায় দাঁড়াল। নাহ পিছনের রাস্তায় যেতে হবে। রিকশাতো এই রাস্তায় চলে না। নাখাল পাড়ায় ভাইয়ের বাসায় যেতে হবে। পকেট হাতিয়ে দেখল একটা একশ টাকা ও দুইটা পঞ্চাশ টাকার নোট আছে। যেতে লাগবে মাত্র চল্লিশ টাকা। বাজারের রাস্তার গলিতে এখন অনেক মানুষ ঘুমানোর আয়োজন করছে। এ এক অন্য জগত।

কালো জুতো, কালো প্যান্ট, কালো কোট, সাদা শার্ট জড়ানো গায়ে বাম হাতে জলন্ত সিগারেট নিয়ে বেশ সাহেবী ভাব নিয়ে ফুটপাতে হাঁটছে শাহেদ। রাস্তার পাশে অবশ্য ফুটপাত অবশিষ্ট নাই। সব দখল হয়েছে। কয়েকটা কুকুর শুয়ে মাথা উঁচিয়ে জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। সবকটার চোখ শাহেদের দিকে। ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে চিড়িয়া মনে হল শাহেদের। কুকুরগুলো ওকে দেখছে। মনে হচ্ছে যেন, আজব বিষয়ই দেখছে ওরা। থমকে দাঁড়ালো ও।
-'কি দেখছিস। শালা কুত্তা, দাঁড়া। আমিও দেখাচ্ছি।' বলে একটা কুকুরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল শাহেদ। কুকুরটা কু কু করে মাথা নিচু করে শুয়ে পড়ল। জয়ের একটু হাসি দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করল ও। এসবের মাঝে সিগারেটের কথা মনেই ছিল না ওর। ওটা শেষ হতে হতে আগুনের আঁচ ঠেকল আঙ্গুলে। টের পেয়ে এক ঝাঁকিতে ফেলে দিল সিগারেটের জলন্ত ফিল্টার।

রাস্তার মোড়ে একটা রিকশার জন্য অপেক্ষা করছে শাহেদ। হঠাৎ শার্ট ও লুঙ্গি পড়া এক লোক আসল ওর কাছে। কাঁধে প্রায় পুরোপুরি ছেড়া একটি ব্যাগ। মুখ মলিন। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে শূন্যতা ফুটে উঠেছে মাঝ বয়সি এ লোকটার চেহারায়।
'ছার, আমার বাড়ি লালমনিরহাট। মায়রে নিয়া ঢাকায় একটা কাজে আইছিলাম। সারা দিন অনেক ঘুরছি। আমার মা কিছু খায় নাই।' বলেই লোকটা হাত দিয়ে কিছুটা দূরে কালো বোরকা পড়া এক মহিলাকে দেখালো।
'কিছু দেন ছার। মায় সারাদিন কিছু খায় নাই।'
লোকটার মা যেন ক্লান্তিতে একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে কোন মতে দাঁড়িয়েছেন। কোন কথা না বলে বিরক্তি দেখিয়ে সামনে পা বাড়ালো শাহেদ। একটু পরে পিছন ফিরে দেখল লোকটা ওর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আবার সামনে হাঁটল ও। একটা রিকসায় উঠে সোজা বাসার দিকে। ওর চিন্তা হল মানুষ যে কত ধান্দাবাজি করে। আবার চিন্তা করল লোকটা যা বলল তা সত্যিও হতে পারে। খুব অসহায়ইতো দেখাচ্ছিল তাদের। লোকটার শেষ কথাটা ওর কানে বাজে, 'মায় সারাদিন কিছু খায় নাই।' পকেটে তো টাকা ছিল সেখান থেকে একশ টাকা দিলে তেমন ক্ষতি তো হত না। ওরা দুজন সারাদিন রোদে হেঁটে ক্লান্ত। বাড়ি সেই কোথায়। একটু খাবারের আশায় ওর কাছে হাত পেতেছিল লোকটা। ওদের অবস্থা চিন্তা করতেই চোখ দিয়ে পানি ঝরল শাহেদের। তখন কি হয়েছিল ওর। টাকাটা দিল না কেন? দেরী না করে রিকসাওয়ালাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মামা যেখান থেকে এনেছেন সেখানে যান।'

নির্দেশমত রিকশা আগের জায়গায় এসে ব্রেক কষল। কিন্তু কোথায় ওরা। শাহেদ রিকসা থেকে নেমে আশেপাশে দেখল। না তো নাই। আগে অনেকবার ধোকা খেয়েছে ও। কিন্তু মন সাড়া দিল এটা তো ধোকা নয়। ওরা খায় নাই সারাদিন। কত মানুষইতো না খেয়ে থাকে। কিন্তু সবাই তো ওর কাছে চায় না। মাত্র দুইজনকেও খাওয়াতে পারত না শীতের এ রাতে! অপরাধীর মত হৃদয়ের কম্পনে কাঁদল শাহেদ। নিঃশব্দের ক্রন্দন ঠোঁটকে শুধু নোনতা স্বাদই দিল। শাহেদ ল্যাম্পপোস্টের নিচে প্যান্টের দু পকেটে হাত দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। সোডিয়ামের হলুদ আলোর পরশে লেপ্টে আছে সবকিছু। ভারি কুয়াশা পড়েছে রাস্তায়। বেশি দূরে দেখা যায় না। দূরে কুয়াশার ভিতর থেকে একটা নেড়ি কুকুর বেরিয়ে দৌড়ে আসছে। রাস্তার পাশে বাতির নিচে একটা মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন থমকে দাঁড়াল কুকুরটা। তাকিয়ে দেখল নিশ্চুপ লোকটাকে।

সায়াহ্ন সময়। ৬ আশ্বিন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
৩৯৭ কবি আহসান হাবীব সড়ক, পিরোজপুর।

ভাসমান ভাষা সৈনিক

১

'এই মিয়া ভালা তো।' কারও ডাক শুনে তুহিন ইব্রাহীম মুখ তুলে তাকালেন। এক কাস্টমারের জন্য পান বানাচ্ছিলেন। সিগারেট কোম্পানির হাশেমের ডাকে মুখ তুলে তাকালেন তুহিন। মুখে অমায়িক এক হাসি দিয়ে বললেন, 'এইতো আল্লাহর ইচ্ছায় ভালই আছি।'

'সিগারেট লাগব নাকি?'

'না, আপাতত লাগবে না, আর দিন দুই চলবে।'

'তো মিয়া মিষ্টি জর্দা দিয়া একটা পান বানাও, তোমার হাতে পান খাই না কয় দিন।'

পান বানাতে বানাতে হাশেমকে জিজ্ঞাসা করলেন তুহিন, 'বাসার সবাই কেমন আছে?'

'আমাগো গরীবের আবার থাকা।'

মুখে আফসোসের সুর তুলে তুহিন বললেন, 'আহা ওরম কথা কইও না। আল্লায় বেজার অইব।'

'বেজার ওইব, আমাগো মতন গরীবের উপর বেজার অইয়া কি হইব মিয়া। বেজার না ওইয়াও কি ওইব। আমরা শালা খয়রাতি। খয়রাতিই থাহুম।' মুখে বিশ্রী একটা ভেংচি কাটল হাশেম। ভেংচিটা কাকে কাটল তা হয়ত হাশেমেরও অজানা। অনেক কিছুই জানে না ও। জানতেও চায় না। জেনেই বা কি হবে? এই যেমন ওর কাছে রাষ্ট্রের কোন গুরুত্বই নেই। রাষ্ট্র থাকলেই কি আর না থাকলেই বা কি। এতে ওর বা তুহিনের কি আসে যায়। বছরের পর বছর ঘুরে যায়। হাশেম আর তুহিনের বয়স বাড়ে এর চেয়ে বেশি কিছু ওদের কপালে জোটে না।

তুহিনের টং দোকানের পাশে বেঞ্চে বসে মিষ্টি জর্দা দিয়ে পান খাচ্ছে হাশেম। চোখ বন্ধ করে চুপচাপ জাবর কাটছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর সকল সুখকেও বন্ধ চোখে হাতিয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কি মনে করে তুহিনকে প্রশ্ন করল, 'মিয়া কাইল না একুশে ফেব্রুয়ারি?'

'ও তাই তো, আমি তো ভুইলা গেছিলাম।'

'মনে রাইখা আর কি করবা। একুশে ফেব্রুয়ারি কি দিছে তোমারে? এহোনও তোমার দেখছি দরদ উতলাইয়া পড়ে। আরে মিয়া দরদটারে লুঙ্গির কোচে রাখ। দেখবা মনে শান্তি পাইবা। এই দ্যাশে ভালোবাসা দিয়া পেটে কিছু পড়ব না। হুদাই প্রেম দেখাও। আর কি যেন এটটা কও। ভাষা, মিয়া পাগলা কুত্তায় কামড়াইছিল তোমারে।'

'ঐ সময় আমাগো দায়িত্ব ছিল, মায়ের ভাষার জন্য সংগ্রাম করা। আমরা করছি। এহোন কে কি দিল না দিল এর হিসাব করুম ক্যান।'

'আরে রাহ মিয়া। খালি গলাবাজি কর। সাহেব বাবুগো...।' কি যেন বলতে গিয়ে বলল না হাশেম। কতক্ষণ ফের চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'আমি হুদাই তোমার লগে বক বক করতাছি। তবে মিয়া কিচ্ছু লাভ অয় নাই। ভাষার প্রতি, দ্যাশের লইগা ভালোবাসা দিতে এহন কোন মানুষ নাই।'

কথা বলতে বলতে হাশেম তার তিন চাকাওয়ালা ভ্যান নিয়ে চলে গেল। তুহিন ইব্রাহীম হাশেমের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আসলে একুশে ফেব্রুয়ারি কি দিয়েছে ওনাকে। হ্যাঁ দিয়েছে, এই ভাষা, মনের সকল আবেগ দিয়ে কথা বলে সবার সাথে। এই ভাষার পথ ধরেই জন্ম হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। এর জন্য ওনাকে অনেক হারাতে হয়েছে।

২

গরীব মা-বাবার এক মাত্র সন্তান তুহিন ইব্রাহীম। মা-বাবা মারা যাবার পর গ্রামের মাতব্বররা তাদের ভিঠে মাটি টুকুও কেড়ে নেয়। অনেক কষ্টে ঢাকা এসে কাজী নজরুল ইসলাম কলেজে ভর্তি হন কিশোর তুহিন। ১৯৫১ সালে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র তুহিন। প্রথমে বিভিন্ন কাজ করে ও লজিং থেকে নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এর মধ্যে কয়েক বছর ধরে চলছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের টালবাহানা। তারা বাংলা ভাষাকে দূরে রাখতে চায় কিন্তু পূর্ব পকিস্তানের মানুষ তা কোনভাবেই মানতে নারাজ। এ দেশের মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চায়। তাদের মধ্যে তুহিনের মত শোষিত, জীর্ণ গরীবের প্রতিনিধিরাও আছে। তাদেরও আছে মাতৃভাষার প্রতি গভীর টান।

বায়ান্ন সালে তাদের এই মনোভাব চরম আন্দোলনে রুপ নেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে মিছিলের ডাক দেয়া হয়। সেদিন হাইকোর্টের মোড়ে যখন মিছিলে তুহিন ও তার বন্ধু সোহান শ্লোগান দিচ্ছিল, ঠিক

তখনই একটা গুলিতে সোহান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তুহিন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর ডান উরুতে একটা গুলি এসে লাগল। ‘ও মা।’ বলে চিৎকার করে তুহিনও মাটিতে পড়ে গেল। এরপর সেদিন কি ঘটল কিছুই জানে না তুহিন।

৩

ভাষা আন্দোলন হয়েছে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হল। তুহিন ইব্রাহীমের বয়স এখন সত্তরের উর্দ্ধে। ঐ দিনের পর থেকে ওনাকে ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। পরে লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি আর। পঙ্গু বলে কোন ছোট খাটো চাকরিও জোটে নাই ওনার কপালে। তুহিন বিয়ে করেননি, যদি সেখানেও বঞ্চনার শিকার হন এই ভয় থেকে। তারপর বাকি জীবন একটা ভাসমান পানের দোকানে পার করছেন তুহিন ইব্রাহীম। তার ভাসমান দোকানটি ঢাকা মেডিকেলের সেই স্মৃতিময় গেটের বিপরীতে। মেডিকেলের গেট দেখে ভাষা আন্দোলনের জ্বালাময়ী সময়কে স্বরণ করতে চান বলে উনি এখানে দোকান করেছেন। তুহিনের চোখে পানি ছলছল করছে, ওর কষ্ট হয়। বর্তমানে নেতারা যা ইচ্ছা তা করে বেড়াচ্ছে, অনিয়মটা নিয়মে পরিণত করেছে। তারা বায়ান্নর চেতনার কথা বলে, একাত্তরের চেতনার কথা বলে কিন্তু চেতনাকে ভালোবেসে কাজ করে না। শহীদ মিনারে, স্মৃতি সৌধে ফুলের স্তুপ করে তাদের দায়িত্ব শেষ করে। তবে কাদের জন্য বায়ান্নর অন্দোলন, একাত্তরের আন্দোলন, দেশকে এরকম দেখতে চেয়েছি কি কোন সৈনিক? স্বাধীনতার এত বছর পরও কেন স্বাধীনতার স্বাদ নেই?

তুহিন তাকিয়ে মেডিকেলের গেট দেখছেন। ওনার চোখে সোহানের চেহারা ভেসে উঠছে। অনেকটা অভিমানি ছেলে সোহান।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর রুমে ফিরল সোহান। তুহিন তখন টেবিলে বইতে মুখ ডুবিয়ে বসে ছিলেন। শত ক্ষোভ নিয়ে বলল সোহান, ‘ওরা কাল ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে। কিন্তু তাই বলে আমরা থেমে থাকব না। কাল আমাদের মিছিল হবেই।’
‘কাল কোথায় মিছিল হবে?’ তুহিনের প্রশ্ন।
কিছুক্ষণ চুপ থেকে সোহান বলল, ‘দাঁড়া একটা জিনিস দেখাচ্ছি।’ এরপর রুমের বাইরে থেকে কিছু প্লাকার্ড নিয়ে রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল সোহান। তুহিন প্লাকার্ড গুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। বিভিন্ন প্লাকার্ডে বিভিন্ন রকম লেখা।
‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।’
‘দাবি একটাই রাষ্ট্রভাষা বাংলা।’

সূর্যের তাপ মোটামুটি কড়া। তুহিন আর সোহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। সোহানের হাতে প্লাকার্ডগুলো একটা কাপড়া দিয়ে পেঁচানো হয়েছে। যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে পৌছল তখন ওখানে অনেক মানুষের সমাগম। সবাই ওখান থেকে ঢাকা মেডিকেলের মাঠের দিকে চলল। মেডিকেলের মাঠে আরো মানুষের অবস্থান। এখানের সবাই ক্ষুদ্ধ। কারও হাতে প্লাকার্ড, জাতীয় পতাকা। কারও মাথায় জাতীয় পতাকা আর কাফনের সাদা কাপড়। সবাই সমস্বরে শ্লোগান দিয়ে সামনে চলল ধীরে ধীরে। মেডিকেলের গেট পেড়িয়ে মিছিলটি যাচ্ছে হাইকোর্টের দিকে। তুহিন আর সোহার পাশাপাশি হাঁটছে। তুহিনের হাতে একটা প্লাকার্ড। সোহান সর্বশক্তি দিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে।
‘রাষ্টভাষা বাংলা চাই।’

হাইকোর্টর মোড়ে মিছিলটি আসতেই শুরু হল পুলিশের লাঠি চার্জ আর সেই সাথে গুলি। সবাই ছোটাছুটি করছে যে যে দিক পারছে। হঠাৎ একটা গুলির সাথে মাটিতে পড়ে গেল সোহান। তখনই আরো একটা গুলি লাগল তুহিনের ডান পায়ে।

টিন পেটানো শব্দে তুহিনের চিন্তা ফিরে বাস্তবে এলো। উনি আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছেন উচ্ছেদকারী পুলিশের দিকে। যারা তার চার চাকাওয়ালা পানের ভাসমান দোকানটিকে তার চোখের সামনেই গুড়িয়ে দিচ্ছে।

রাতের প্রথম প্রহর। ০৫ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
কুমিল্লা।

নুহাশে হুমায়ূনের সাথে

ভাওয়াল গড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটছে রানা ও রাতুল। লাল মাটির উপর ইটের বিছানো পথে হাঁটছে কথা বলতে বলতে। চারপাশে শুধু বিশাল বড় কালো শালগাছ। এই বিশাল শালবৃক্ষ রাজ্যের শেষ বহু দূরে।

'শেষ পর্যন্ত তুই তাহলে আমার বাড়িতে আসলি।'

'আসলাম আর কি? বাহ! এই জঙ্গলটা খুবই সুন্দর।'

'দেখতে হবে না কার এলাকা।'

'দেখলামইতো তোর মত একটা বদমায়েশের এলাকা।'

'আমাকে তোর বদমায়েশ মনে হয়।' রানা রাতুলের দিকে করুণ নয়নে চাইল।

রাতুলের উওর, 'সে তো আর নতুন করে বলছি না খোকা, অনেক আগে থেকেই বলছি।'

'যা ই বলিস আমার এলাকাটা কিন্তু খুবই সুন্দর।'

'আমি কিন্তু তা অস্বীকার করছি না। এই শালবনটা আমার কাছে দারুণ লাগছে। দেখ, গাছের গোড়ায় কত সুন্দর ছোট গাছ ও লতার সমারোহ।'

'আমাদের এলাকায় এটা গজাড়ি বন নামে পরিচিত।' রানা রাতুলকে বলল।

রানা ও রাতুল একই সাথে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে। এই জুন মাস জুড়ে ওদের গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। যাকে ওরা বলে আম-কাঁঠালের ছুটি। এই ছুটিতে গতকাল রাতুল দুই দিনের জন্য রানার বাড়িতে আসল কয়েকটা উদ্দেশ্যকে হাতে নিয়ে। হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতি বিজড়িত নুহাশ পল্লীতে কিছু সময় ব্যয় করা আর তিন জেলায় অবস্থিত বিশাল ভাওয়াল গড় ঘুরে দেখা। রানা জঙ্গলের ভিতর ডানে মোড় নিল ।

'কিরে ওদিকে কই যাস?'

'কেন নুহাশে যাবি না?' রাতুলের দিকে ঘুরে রানা প্রশ্ন করল।

'যাব না মানে, আরে মামায় কি কয়?'

'তো কোন কথা বলিস না, আয়।'

রাতুল রানাকে প্রশ্ন করল, 'এই মাটির রাস্তা দিয়ে যেতে হবে?'

'তো তোর জন্য কি মহাসড়ক বানিয়ে রাখবে নাকি রে!'

ওরা কথা বলতে বলতে নুহাশ পল্লীর মূল ফটকে এসে পৌঁছল। নুহাশ পল্লীর সামনের দিকে মাটির মোটা প্রাচীর তার উপরে ছোট করে দোচাল টিনের চাল, বৃষ্টি থেকে মাটির দেয়ালকে রক্ষা করার জন্য যে এই চালা তা বোঝা যাচ্ছে। নিজ এলাকা বলে নুহাশ পল্লীর কয়েকজনের সাথে রানার জানা শোনা আছে।

ওরা পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করল। রানার পরিচিত একজন ফটকের ভিতরে লিচুতলায় প্লাস্টিকের চেয়ারে বসালো ওদের। রাতুল লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এখানে কয় বছর কাজ করছেন?'

'এইতো চার বছর।'

'ও আচ্ছা। তাহলে তো হুমায়ূন আহমেদের সাথে দেখা হয়েছে।'

'জ্বী হতো।'

'কেমন কথা হতো?'

'খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। আমাদের সাথে এক দিনের জন্যও খারাপ ব্যবহার করেননি।'

'আচ্ছা ঐ বিল্ডিংটায় কে থাকেন?'

'হুমায়ুন স্যার থাকতেন।'

'কেন উনি না বৃষ্টিবিলাসে থাকতেন? বৃষ্টিবিলাসটা কই?'

'এইতো একটু সামনে। স্যার এই বিল্ডিংটায় থাকতেন, যখন বৃষ্টি শুরু হতো তখন এখান থেকে খালি পায়ে হেঁটে ভিজতে ভিজতে বৃষ্টিবিলাসে যেতেন। ঐখানে টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনতেন।'

আরও অনেকক্ষণ কথা বলার পর ওরা লিচুতলা থেকে উঠে দাঁড়াল। রাতুল লোকটাকে বলল, 'আপনার সাথে কথা বলে ভাল লাগল, আমরা এখন একটু ঘুরে দেখি।' লোকটা রাতুলকে একটা আম দিল, যে আমটা রাতুল প্রথম থেকেই লোকটার হাতে দেখে আসছিল।

'এই আমটা নিন, খেতে ভাল। গাছের নিচ থেকে কিছুক্ষণ আগে কুড়িয়ে পেয়েছি।' রাতুল পরম আনন্দে আমটি গ্রহণ করল। ওরা লিচুতলা দিয়ে সামনে চলল।

ওরা আমগাছগুলোয় অনেক আম দেখল, যে গুলোতে সবে মাত্র পাকা ধরেছে। রাতুল গাছের তলা থেকে আরও কয়েকটা আম কুড়িয়ে পেল। খুবই তাজা আম। আমগুলোর চেহারা দেখে মনে হল খেতে ভালই হবে। ওরা হুমায়ুন আহমেদের কবরকে বামে ফেলে অতি মন্থর গতিতে সামনে এগিয়ে চলল। ঔষধি গাছের বাগানের পাশে দাঁড়িয়ে আমগুলো খেল রাতুল আর রানা। আসলেইতো আমগুলো দারুণ মিষ্টি। এগুলোতে নেই কোন আঁশ।

রাতুল বৃষ্টিবিলাসের দিকে চেয়ে আছে মাঠের কিনারায় দাঁড়িয়ে। ও ভাবছে এই সামান্য টিনের ঘরটা কতই না মহামূল্যবান।

'রাতুল কি দেখো।' পিছন থেকে হঠাৎ কারও কথায় ফিরে তাকলো ও। কাঁধের ওপর একটা শাল, চোখে কালো ফ্রেমের বড় চশমা, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পড়ে খালি পায়ে হুমায়ূন আহমেদ ওর দিকে তাকিয়ে হাসছেন, 'কি দেখো রাতুল?'

এবারের প্রশ্নে রাতুল উওর করল, 'বৃষ্টিবিলাস দেখছি, আপনার বৃষ্টিবিলাস।'

'এই বৃষ্টিবিলাস তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

'খুবই ভালো।'

'এটি আমি বানিয়েছি বৃষ্টির সময় টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শুনব বলে।'

'আমারও ভালো লাগে।'

'কি?'

'এই যে বৃষ্টিতে ভিজতে, বৃষ্টির শব্দ শুনতে।'

'রাতুল চলো তোমাকে আমার গড়া নুহাশ পল্লীটা ঘুরে দেখাই।'

'চলুন, আপনার সাথে যে ঘুরে দেখব তা আমি কল্পনাও করি নাই।'

কিছুক্ষণ আগে তুমুল বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা। এমনভাবে হয়েছে যেন এটাই শেষ বৃষ্টি। বৃষ্টি, মাটি, ঘাস সব কিছু অল্প সময়ের জন্য মিশে একাকার হয়েছিল। এখন একদম তরতাজা রোদ উঠেছে। মনে হচ্ছে যেন এটাই প্রথম সূর্যের আলো। হুমায়ূন আহমেদ আর রাতুল ধীরে ধীরে বৃষ্টিবিলাসের সামনে থেকে হাঁটতে হাঁটতে ঔষধি বাগানের সামনে এসে দাঁড়াল।

'রাতুল !'

'জ্বী,'

'তুমি আগে আসোনি কেন?'

'কি বলেন জনাব? এইতো আমি এসেছি।'

'তোমার হাতে ওটা কি রাতুল?'

'কবি, আপনার কবি।'

'তোমার কেমন লেগেছে বইটা, তুমি কি পড়েছ?'

'জ্বী, পড়েছি। আমার ভালোই লেগেছে। আপনাকে আমার একটা কথা বলার ছিল। অনেক দিন ধরে বলবো ভেবেছি, কিন্তু আপনার সাথে এটাই যে আমার প্রথম সাক্ষাত।'

'কি কথা? বল।'

'এই যে, আপনার সাহিত্যকর্ম নিয়ে। আপনি বাংলা সাহিত্যকে নিয়ে গেছেন আলাদা একটা মাত্রায়। সবার পক্ষে ঐ রকম জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। একদম সহজ-সাবলীল ভাষায় হয়েছে আপনার লেখাগুলো। আপনিই বাধাকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যকে পৌছাতে পেরেছেন অনেক দূর অবধি। বলে গেছেন সহজভাবে গড় গড় করে। বাংলা সাহিত্য যে ...।'

হুমায়ূন আহমেদ রাতুলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কখন শুরু করেছ মনে আছে। এবার থামো। বল তোমার খবর কি? লেখা-লেখির কত দূর?'

'আমার আবার লেখা-লেখি। সাহিত্যের সামান্য এক ছাত্র আমি। আসলে এই পৃথিবীতে সবাই হলো কবি, লেখক। কেউ তার ভিতর ঘুমিয়ে থাকা সত্ত্বাকে জাগাতে পারে, কেউ পারে না।'

'আচ্ছা দেখ তো কান্ডটা, আমরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। চলো রাতুল, সামনের দিকে যাওয়া যাক।'
'দাঁড়ান জনাব, আমার পায়ের জুতা খুলে নেই। আপনি খালি পায়ে, আমিও আপনার সাথে এই ভেজা ঘাসের সজীবতা আর কাদার স্পর্শ নিব।' রাতুল ওর পায়ের জুতা জোড়া খুলে একটা গাছের গোড়ায় রাখল। খালি পা সবুজ ঘাসের উপর রাখতেই ঘাসের কোমলতা ওর শরীরে বইলো।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে মৎস্য কন্যা ঝর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে আবারও চলতে শুরু করল। হুমায়ূন আহমেদ ভ্রু কুচকে অতি আগ্রহে রাতুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা রাতুল তোমার কাছে সাধারণ মানুষ আর কবি-লেখকের মধ্যে পার্থক্য কি?'
'সবাই তো কবি-লেখক। একটা অতি সাধারণ কথা যেটা সবাই বোঝে, বলতেও পারে কিন্তু কবির মত করে কবিতায় বা লেখকের মত করে লেখায় লিখতে পারে না। কবি-লেখকরা লিখতে পারেন বলেই তারা কবি-লেখক। বাকিরা পারে না কারণ তারা নিজেদের ভিতরের কবি বা লেখক সত্ত্বাটিকে খুঁজে পায় না ।'
'দারুণ বলেছ তুমি।'
'আপনার ভালো লেগেছে?'
'হুম।'

এরই মধ্যে কথা বলতে বলতে ওরা পল্লীর পিছনের বড় পুকুরটার ওপারে বড় কদম গাছের নিচে দুটি দোলনায় দুজন বসল। হুমায়ূন আহমেদ আফসোসের সুর তুলে বললেন, 'আহা! কি কান্ড। মৎস্য কন্যা, ভুত বিলাস, লীলাবতি দিঘীর ঘাট ফেলে চলে এলাম কিন্তু তোমাকে ঐ সব নিয়ে কিছুই বললাম না।'
রাতুল মুছকি হেসে বলল, 'এখান থেকে শুরু করলেই বা ক্ষতি কি। আপনার কথা শুনব আমি?'
'মাথার উপরে কি গাছ তুমি খেয়াল করেছ?' দোলনায় দুলতে-দুলতেই রাতুলকে প্রশ্ন করলেন হুমায়ূন আহমেদ।
উপরের দিকে না তাকিয়ে রাতুল উওর করল, 'বৃষ্টিতে ভেজা তাজা ফুটন্ত কদম ফুলভর্তি গাছের তলায় আছি আমরা। বর্ষার প্রথম কদম ফুল।'
'বর্ষার প্রথম কদম ফুল।'
'জ্বী।' রাতুল গান ধরল, 'যদি মনে কাঁদে তবে চলে এসো এক বরষায়।'
'তুমিতো দেখছি আমাকে নিয়েই আছ।' হুমায়ূন আহমেদ আনন্দের সহিত বললেন।
'আপনার সাহিত্যকর্মকে ভালোবাসি বলে আপনাকেও ভালোবাসি। আপনার সাহিত্যকর্ম না থাকলে হয়তো আপনাকে ভালোবাসা হতো না।'
'তুমি একটা সত্য কথা বললে রাতুল, সত্য কথা বললে। এই পৃথিবীতে কর্ম দিয়ে কে না চিরকাল বাঁচতে চায়!'
'আমিও কর্ম দিয়ে চিরকাল বাঁচতে চাই জনাব। এটা মানুষের চিরাচরিত স্বভাব। এটা থাকা অস্বাভাবিক নয় বরং এই স্বভাবটা না থাকাটা অস্বাভাবিক।'
'রাতুল তোমার সাথে কি অন্য কোন সাহিত্যকর্মীর দেখা হয়েছে?'
'একবার কাজী নজরুল ইসলামের সাথে দেখা হয়েছিল।'
'তার সাথে কি কথা হলো তোমার।'
'উনি বললেন, আমাকে ভালোবাসা আর অধিকার সম্পর্কে কিছু বলো তো রাতুল।'
'তুমি কি বললে?'
'কি আর বলব, আমি ক্ষুদ্র মানুষ। বললাম, সৌন্দর্য্য থেকেই ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, সৌন্দর্য্য এক সময় মলিন হয় কিন্তু ভালোবাসা মলিন হয় না। আর অধিকার নিয়ে বললাম, ভালোবাসার সম্পর্কের ধরণ থেকে অধিকারের জন্ম হয় আর অধিকারের হাত থেকে দাবির জন্ম হয়।'
'তারপর উনি কি বললেন?'
'বললেন, শুনলাম। রাতুল আমার একটু তাড়া আছে পরে দেখা হবে। তারপর অনেক দিন হলো তার দেখা পাই নাই।' হুমায়ূন আহমেদ দোলনা থেকে উঠে বললেন, 'চল রাতুল ঘাটের কাছে ঐ বটতলায় বসি।'

ওরা দিঘী লীলাবতির ওপারে শান বাঁধানো ঘাটে বসল। মাথার উপর শীতল ছায়া দিচ্ছে বটগাছ। রাতুল পরম শ্রদ্ধায় বলল, 'আপনার এই গানটি, 'সখি ভালোবাসা কারে কয়, নদীর জলে ভালোবাসা খোঁজার কোন অর্থ কি হয়।' আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি বলি, 'সখি ভালোবাসা কারে কয়, তার জন্য চোখ টলমল কি ভালোবাসা নয়।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে রাতুল বলল, 'জনাব আপনার একটা ছবি তুলি?' রাতুল সাথে নিয়ে আসা ক্যামেরা দিয়ে শার্ট শার্ট করে হুমায়ূন আহমেদের ছবি তুলল। কিন্তু ক্যামেরার স্ক্রিনে কোন ছবি দেখা গেল না। ও বলল, 'মিসিং হয়ে গেছে, আবার তুলি।' হুমায়ূন আহমেদ শুধু ঠোঁটের কোনে একটু হাসি তুললেন। এবারও ক্যামেরার স্ক্রিনে কোন ছবি দেখতে না পেয়ে রাতুল শানের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে ও সামনে কাউকে দেখতে পেল না। রাতুল আশেপাশে তাকিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে খুঁজে পেল না।

রানা অনেকক্ষণ ধরে রাতুলকে খোঁজা খুঁজি করার পর শেষে এই দিঘী লীলাবতির ঘাটে আসলো। 'কিরে কোথায় ছিলি? আমি তোকে সেই কখন থেকে খুঁজছি।' রাতুল রানার মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শুনলো চুপচাপ। রাতুল বুঝে উঠতে পারছে না যেন কিছুই।

রাতের প্রথম প্রহর। ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
পিরুজালী, গাজীপুর।

সেমাই

আকশে প্রচুর পরিমানে কালো মেঘ জমেছে। সূর্যকে দেখা যাচ্ছে না বলা চলে। কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম আকাশ থেকে ঝড়ো বাতাসে সব কিছু ঠান্ডা হয়ে এলো, তারপর শুরু হলো শ্রাবণ মেঘের কান্না। কলস থেকে পানি ঢাললে যে রকম পড়ে ঠিক সেই রকমই ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। এ বৃষ্টি থামতে চায় না, শ্রাবণ মেঘের এ কান্নাটা জমে জমে দীর্ঘ হয়েছে। অনেকক্ষণ পর পশ্চিম আকাশে সূর্যটা হেলে পড়ে হালকা আলো দিতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে সূর্যটা তার তেজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বৃষ্টি এখন থেমেছে অনেকটা, তবে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে রোদের ওপর।

চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন। প্লাটফর্মে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে রেজা চৌধুরী। মেজাজটাও কেমন খিটখিটে, অসময়ে বৃষ্টি দেখলে তার মেজাজ এরকম খিটখিটে হয়ে যায়। আজ ঈদের দিন। ঢাকা থেকে ওর বোন রিয়ার আসার কথা। রিয়ার জন্য রেজা স্টেশনে। রিয়া একটা বেসরকারী ব্যাংকে মতিঝিলে চাকরি করে। ঈদের আগের দিন আসার কথা থাকলেও পরিবহনের কোন টিকিট না পাওয়ার কারণে আজকে ওকে আসতে হচ্ছে। রিয়া রেজাকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল, এই ঈদে ওর আসা হবে না। কিন্তু রেজার কথা, 'তুই না আসলে যে কোন ঈদই হবে না, বোন।'

আর কি করা, এক মাত্র ভাইয়ের সাথে ঈদ কাটাতেই কষ্ট স্বীকার করে ঈদের দিনে এই যাত্রা। রিয়া যখন খুবই ছোট তখন ওদের বাবা-মা মারা যান। রেজা মেট্রিকে তখন। সেই থেকে রিয়াকে মানুষ করার চেষ্ট রেজার, পেরেছেও। এখন বাকি শুধু একটা কাজ। রিয়াকে ভাল, মর্যাদাবান পাত্রের হাতে তুলে দেয়া। ওকে বিয়ে না দিয়ে নিজেও বিয়ে করার কথা ভাবছে না রেজা।

ও একবার অনুসন্ধান কক্ষে গিয়ে ট্রেনের খবর নিল। এখনও কয়েক ঘণ্টা লাগবে। সেলফোনটি বেজে উঠলো। রিয়ার ফোন, 'হ্যালো রিয়া, কোথায় এখন?'

'এই তো ভৈরবে।'

'এখনও ভৈরবে কেন?'

'এখানে এসে ট্রেন খারাপ হয়েছে। মেরামত চলছে। ঠিক হয়ে যাবে তুমি চিন্তা কর না। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

'আমি তো স্টেশনে এসেছি।'

'তুমি এখন বাসায় যাও। আমি পৌঁছার এক ঘন্টা আগে তোমায় ফোন দিব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

রেজা স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তার ডান পাশে রাখা গাড়িতে উঠতে যাবে ঠিক তখনই রাস্তার অপর পাশে জনা বিশেক মানুষের জটলা আর চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা গেল। ও জটলার দিকে এগিয়ে গেল। ছেড়া গেঞ্জি আর কালো হাফপ্যান্ট পড়া দশ/এগারো বছরের একটা ছেলেকে মারছে সবাই মিলে। ওর নাক দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। বিশাল ভূড়ির গোফওয়ালা কালো একটা লোক ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে জোরে জোরে চড় মারছে আর বলছে, 'ক্যান চুরি করসছ। আর চুরি করবি, বল বল। আর চুরি করবি।' লোকটা ছেলেটার গালে সর্বশক্তি দিয়ে চড় মারছে। রেজা জটলার মধ্যে চলে আসল। ও চিৎকার করে বলল, 'ছাড়ুন, ছাড়ুন, ওকে এত মারছেন কেন?'

লোকটা রাগন্বিত স্বরে বলল, 'মারতাছি কি আর স্বাদে মশায়। ও আমার দোকান থ্যাইকা সেমাই চুরি করছে।'

'তাই বলে এরকম মারবেন। খবরদার আর মারবেন না বলছি।' রেজার কথা কানে তুলল না লোকটা। এক টানা মেরেই চলল। রেজা চোয়াল শক্ত করে চিৎকার দিয়ে বলল, 'আমি ম্যাজিস্ট্রেট রেজা চৌধুরী। ওর গায়ে আর এক বারও হাত তুলবেন না। একদম ভালো হবে না।' লোকটা মুহূর্তের জন্য রেজার দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। রেজা ছেলেটাকে নিজের দিকে টেনে নিল। ছেলেটার নাক থেকে অনর্গল রক্ত ঝরছে। ও লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনারা এতগুলো লোক মিলে এই বাচ্চা ছেলেটাকে মেরেছেন। লজ্জা করে না আপনাদের। চলে যান এখান থেকে।'

ছেলেটিকে গাড়িতে করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গেল ও। জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসার পর রেজা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি চুরি করেছো?' ছেলেটা মাথা নেড়ে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ করেছি।'

'কেন চুরি করেছো?'

ছেলেটা টলমল চোখে উত্তর দিল, 'আমার ছোড বোন ঈদে সেমাই খাইতে চাইছে। আইজগা তো ঈদের দিন। আইজ সক্কাল থেইক্কা খুব কানছে ও। আমার কাছে ট্যাকা ছিল না। এর জইন্য আমি দোকান থাইক্কা সেমাই চুরি করছি। বিশ্বাস করেন আমি

আর কিচ্ছু চুরি করি নাই।' ওর কথা শুনে রেজা চোখে পানি ধরে রাখতে পারল না। ছেলেটাকে প্রশ্ন করল, 'তোমার মা-বাবা কোথায়?'

'বাজান ম্যালা বছর ধইরা জেলে। আর মার অসুখ বহুত দিন। মা কামে যাইতে পারে না। মালিক বেতনও দেয় নাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। আমি তোমায় সেমাই কিনে দিব।'

ওকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে দোকান থেকে পাঁচ প্যাকেট সেমাই, দুধ আর চিনি কিনে দিল রেজা। ছেলেটার হাতে হাজার টাকার পাঁচটি নোট দিয়ে বলল, 'এই টাকা তোমার মাকে দিবে।' ছেলেটা ওর দিকে কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, 'আপনে ম্যালা ভালো। আর ওরা আমারে কত্ত মারছে।'

'থাক দুঃখ করো না। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাও, তোমার বোন সেমাই খাবে না?' ছেলেটা কোন উত্তর না করে রাজ্য জয়ের উজ্জ্বল মুখে শুধু বলল, 'আইচ্ছা।'

রেজা ছেলেটার যাওয়ার পথে দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল তার হদিস নেই। ছেলেটার চোখে যেন নিজের ফেলে আসা দিনগুলোকে দেখল। ছোট বোনের এতটুকু আবদার মেটাতে ভাইয়ের কত্ত চেষ্টা। ভাইটাও তো কত ছোট। ছলছল চোখে যেন রিয়ার প্রতিবিম্ব আঁকছে রেজা। চোখের জলে যেন জীবনেরও নোনতা স্বাদ অনুভূত হয়। শেষমেশ ড্রাইভারের ডাকে ও ফিরে তাকাল।

রেজার গাড়ি যাচ্ছে ওর বাংলোর দিকে। তিন রাস্তার সামনে অনেক বড় একটা ভিড় দেখে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে নেমে পড়ল ও। রেজা ভিড় ঠেলে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু এ কি দেখছে ও! সেই ছেলেটার নিথর দেহ উপুর হয়ে পরে আছে। রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে ওর শরীর থেকে। রক্ত যাচ্ছে কালো পিচ ঢালা রাস্তা বেয়ে ঢালুর দিকে। একটা বড় ট্রাকের চাকা ছেলেটার বুকের উপর দিয়ে চলে গেছে। ওর দেয়া হাজার টাকার নোটগুলো একটু দূরে বিছিন্নভাবে পড়ে আছে। ছেলেটা এখনও সেমাই এর প্যাকেটগুলো শক্ত করে ধরে আছে। সেমাইয়ের প্যাকেটগুলোতে কেমন করে যেন রক্তের দাগ লাগে নাই। রেজা নির্বাক হয়ে ছেলেটার নিথর দেহ আর সেমাইয়ের প্যাকেটগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

রাতের দ্বি প্রহর। ৭ শ্রাবণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।
কুমিল্লা।

শেষ চিঠি

খুলনা রেলওয়ে স্টেশন। ট্রেন থামছে আর ঢুকছে হুইসেল দিয়ে। যেমন ঝড়ের বেগে আসা তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে চলা। ট্রেনের হুইসেলের বিকট শব্দটা একটা বিষণ্নভাবের আবির্ভাব ঘটায়। অবশ্য ওতে মধুরতাও থাকে। তবে বিষণ্নভাবটা বেশি বৈকি।

আন্তঃনগর সূবর্ণা এক্সপ্রেস ধীরে ধীরে স্টেশন ত্যাগ করছে। ট্রেনটি যেন এক পা এক পা করে স্টেশন ছেড়ে যাচ্ছে। অরুণ কুমার ছোট ভাই তাপোস কুমারকে বিদায় দিচ্ছে। ধীর গতিতে চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাইয়ের সাথে কথা বলছে তাপোস। অরুণ প্লাটফর্মে জোর পায়ে হাঁটছে ট্রেনের সাথে সাথে।

'সাবধানে যাস। গিয়েই চিঠি লিখবি কিন্তু।'

'ঠিক আছে দাদা তুমি এবার যাও। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে তো।'

'আর শোন ব্যাগে খাবার আছে। মাঝ পথে খেয়ে নিবি।'

'আচ্ছ ঠিক আছে।'

ট্রেন গতি বাড়িয়ে চলল। প্লাটফর্ম পিছনে ফেলে লাইন বেয়ে ছুটে চলল। যতদূর দেখা যায় অরুণ ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রেনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ ঘুরিয়ে দৃষ্টিকে নিজের পথের দিকে নিবিষ্ট করল।

তাপোসকে নিয়েই অরুণের যত চিন্তা। ওর সব কিছু ঠিক মত চলছে তো। আর হবে না কেন? ওর আছেই বা কে। মাত্র তিন বছরের ছোট তাপোস। ছোট বেলায় বাবা-মা স্বর্গীয় হলে তাপোসকে রেখে যান অরুণের কাছে। আর অরুণকে রেখে যান কার কাছে, অরুণ তা জানে না। কার কাছে ওকে গচ্ছিত রাখা হলো। হয়ত ভগবানের কাছে। ভগবানই অরুণের এক মাত্র অভিভাবক। এরপর দুই ভাইতে পিঠাপিঠি। সময়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে বেড়ে ওঠা। বিশাল স্বপ্ন দেখা। দুঃখের সাথে সন্ধি করে জীবনের পথ একটু একটু করে চলা।

তাপোস ট্রেনের দরজা থেকে সরে এসে নিজের আসনে বসল। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাতাস এসে ওর লম্বা চুলকে নাড়া দিয়ে যায়। যত দূর চোখ যায় প্রান্তর ছাড়িয়ে অপর প্রান্তে এক দৃষ্টিতে স্থির হয়ে চেয়ে আছে। ট্রেন চলছে যেন বিভিন্ন দুনিয়ার মধ্য দিয়ে। কখনও কালো বনের মাঝ দিয়ে, রৌদ্র আর ছায়ার খেলার ভিতর দিয়ে। কখনও বাঁশ বাগান, লাল মাটির বাঁধানো ঘরের সমারোহের পাশ দিয়ে। আবার বিস্তৃর্ণ মাঠের পর মাঠ পেড়িয়ে বাস্তুহারা ট্রেন ছুটছে। হুইসেল বাজছে থেমে থেমে, এই হুইসেল যেন বিরহে কাতর সকল নর-নারীর বিষণ্নতার চেয়ে আরও বিষণ্ন।

সকাল বেলা 'তাপোস জুয়েলার্স' এর ভিতর জ্বলন্ত আগরবাতি হাতে নিয়ে সমস্ত দোকানের ভিতর ঘুরল অরুণ। শেষে সিন্ধুকের উপরে রাখা গনেশের ফ্রেমে বাঁধান ছবিটির সামনে গিয়ে কর জোড়ে প্রণাম করল। 'আশীর্বাদ কর ঠাকুর। আশীর্বাদ কর।' জ্বলন্ত আগরবাতিগুলো পাশের দানিতে রাখল। সিন্ধুকের ভিতর থেকে সোনার অলঙ্কারগুলো বের করে শো-কেজে সাজাতে লাগল অরুণ কুমার। দেয়ালের বড় ঘড়িটির দিকে তাকিয়ে মুখে আফসোসের সুর তুলে স্বগোতক্তি করতে লাগল, 'নাহ, ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সকাল সাড়ে নয়টা বাজল, চার দিকে কেমন রোদ ঝকমক করছে কিন্তু বাবুর দেখা নাই। আরে সব কাজ যদি আমাকেই করতে হবে তাহলে তোকে রেখে কি লাভ? শুধু ফাঁকি দেবার চেষ্টা। না ওকে আর রাখা যাবে না। ওকে বাদ দিতেই হবে। কাল থেকে ও বাদ।'

বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা আজ নতুন নয়। প্রতিদিন সকালে ঠাকুরের পূজা সেরে কাজ থেকে কর্মচারী দেবাশিষকে বাদ দেয়া হয়। এটা অরুণের প্রতিদিনকার রুটিন। এরই মধ্যে দেবাশীষ এসে হাজির।

'তাহলে বাবু সাহেবের এখন আসা হয়েছে?'

'আসলে দাদা কোন কিছু পাচ্ছিলাম না তাই হেঁটে আসতে হলো।'

'হয়েছে আর কথা বাড়াতে হবে না।'

দেবাশীষ মাথা নিচু করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। মধ্যাহ্নের দিকে পিয়ন একটা চিঠি দিয়ে গেছে। তাপোসের চিঠি। ও গিয়ে পৌঁছেছে, ভালোভাবেই পৌঁছেছে। সামনে পরীক্ষা তাই এসেই ব্যস্ত হয়ে পরেছে।

শোবার ঘর থেকে নিরুপমা কড়া নাড়ার শব্দে ছুটে চলল। আবার জোরে কড়া নাড়ার শব্দ।

'আরে বাবা আসছি তো। আসছি।' নিরুপমা দরজা খুলে অরুণকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি গো, তুমি?'

'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাই চলে এলাম।'

অরুণ শোবার ঘরে এসে দোলনা চেয়ারে বসল। নিরুপমা ওর পিছন পিছন আসল।

'কি হয়েছে তোমার?'

'বুকে ব্যথাকরছে। এক গ্লাস পানি দেবে?'

অরুণ পানি খেয়ে খালি গ্লাসটি নিরুপমার হাতে দিল।

'নাড়িকেলের নাড়ু আর চালের গুড়ার ছাতু করেছি, দেব?'

'দিতে পার। তবে সঙ্গে এককাপ রং চা হলে ভাল হয়।'

'আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি হাতে-মুখে পানি দিয়ে এসো।'

অরুণ কাপড় পাল্টে ধুতি পরে নিল। গামছা কাঁধে ফেলে কলপাড়ে চলল। হাত-পা ধুয়ে চোখে মুখে পানি ছিটালো। ভেজা হাত দিয়ে গায়ের পৌতাটা একটু মুছে নিল। ঘরের দিকে ফিরলো ও। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। এই সায়াহ্ন সময়টা যেন ধীরে ধীরে অন্ধকার বয়ে আনছে। এরকম এক একটা দিনকে খেয়ে ফেলছে রাত। এরকম চলে আসছে কত বছর ধরে আর কত বছরই বা চলবে।

বিছানায় আধ শোয়া অবস্থায় অরুণ চায়ের কাপে চুমুক দিল। 'বাহ! সুন্দর।'

'কি?'

'চা।'

'শুধু শুধু প্রশংসা করার দরকার নাই, কি বলবে বল।'

'আরে না, সত্যি বলছি।'

খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে স্বামীর সাথে কথা বলে চলছে চট্টোপাধ্যায়দের এই মেয়েটি। নিরুপমা চট্টোপাধ্যায় এক সরলা সুন্দর নারী। বিধাতার সৃষ্টির সকল সৌন্দর্য যেন তার দেহে আছড়ে পড়েছে। স্বামী অরুণের চেয়ে ছয় বছরের ছোট সে। ওদের বিয়ের বয়স দুই বছর। অনেকটা নাটকীয়টায় সম্পর্ণ হয় ওদের বিয়ে। কুমার বংশের ছেলেকে বিয়ে করার জন্য বাবার পরিচয় হারাতে হয়েছে এই ধনীর দুলালী নিরুপমাকে। জাত-কুলের নিষেধাজ্ঞাকে অতিক্রম করে অরুণের গলায় মালা পড়ায় নিরুপমা। ওর ভাষ্য, জাত দিয়ে কি হবে? মানুষের মনটাই আসল। মানুষ দেখতে যত ভালো হোক, মন ভালো না হলে সে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত ব্যক্তি। আর জাতের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই মানুষের মনগড়া ব্যাপার।

'ও, তোমাকে বলতেই তো ভুলে গেলাম।'

'কি?'

'তাপোসের চিঠি পেয়েছি আজ।'

'কি লিখেছে ও?'

'ভাল আছে। সামনে পরীক্ষার কারণে চিঠি লিখতে পারবে না। তোমাকে প্রণাম জানিয়েছে।'

এরপর অরুণ ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে বসল। রান্নাঘর থেকে নিরুপমার কাজ করার টুং টাং শব্দ আসতে লাগল ক্রমান্বয়ে। কাজের মধ্যে অরুণ উঠে গিয়ে কলের গান ছেড়ে দিয়ে আবার বসল। ক্ষণিক পরে কাগজপত্র সব গুছিয়ে রেখে উঠল ও। গান বন্ধ করে দিল। উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। বাইরে অন্ধকার তেমন নাই। সম্পূর্ণটাই জোছনা দখল করে আছে। সবাই তার ভাল রুপটা দেখাতে যেমন ভালোবাসে তেমনি আজ জোছনা ছড়িয়ে চাঁদ পুরো মুখ বের করে হাসছে। নাড়িকেল-সুপাড়ি বাগানের পর বিশাল মাঠ। ঐ বাগানের মাঝ দিয়ে জোছনার আলো দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যায় শেষ সীমানা পর্যন্ত। ঐখানে আলো আর অন্ধকার মিশে একাকার হয়ে গেছে। অন্ধকার কেমন যেন আলোকে ছাড়তে চাইছে না আঁকড়ে ধরে আছে প্রাণপন।

অনেকক্ষণ ধরে গানের শব্দ এবং অরুণের উপস্থিতি টের না পেয়ে নিরুপমা শোবার ঘরে চলে এল। অরুণ বাইরে তাকিয়ে আছে ধ্যান করে। নিরুপমা কিছুক্ষণ চুপচাপ অরুণের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর মৃদু স্বরে ডাক দিল, 'অরুণ।' প্রথম ডাকে কোন উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল নিরুপমা। অরুণ এবার উত্তর করল, 'কি? বল।'

নিরপমা অরুণের সামনে এসে দাঁড়লো। অরুণের চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে নিচের দিকে।

'কি হয়েছে তোমার?'

অরুণ চোখ মোছার বৃথা চেষ্টা করল। 'কিছু হয়নি তো।'

‘তুমি আমার কাছে লুকাচ্ছো?’
‘না না লুকাবো কেন? শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।’ নিরুপমা অরুণের কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর আছে কিনা। সব ঠিক আছে। অরুণ আবার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, ‘ছোটবেলা থেকে হারিয়ে এসেছি সব। প্রথমে বাবা-মাকে, কিশোর বয়সের শেষে হারালাম কাকাকে। এরপর তোমাকে পেলাম তাও তুমি ত্যাগ করে এলে সব। আমি আসলে সর্বনাশা।’ নিরুপমা অরুণের মুখে হাত দিল, ‘না ও কথা বলো না। সব ভগবানের ইচ্ছে।’
‘এর জন্যই তো যত ভয়। ভগবানের ইচ্ছা বোঝা বড় দায়।’
কিছুক্ষণ চুপ থেকে অরুণ বলল, ‘বছর খানেক পর তাপোসকে নিয়ে আর ভয় নেই। ও বড় চাকরি করবে।’
‘তুমি কোনো চিন্তা কর না। সব ঠিক হয়ে যাবে।’ ধরে আসা গলায় বলল নিরুপমা। অরুণের কান্নার মাত্রা বেড়ে গিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে গোড়া কাটা গাছের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরুপমার বুকে।
‘বোকা ছেলে। এরকম কেউ কাঁদে। আমিতো আছি তোমার পাশে।’
স্বামী-স্ত্রী বাহু বন্ধনে থাকল ক্ষণিকের জন্য। যে বাহু বন্ধন শত প্রেমকে হার মানায়। পাহাড় বিস্তৃত দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। যা অফুরন্ত শক্তির উৎস। এই বাহু বন্ধন পাওয়ার জন্য নারী-পুরুষেরা পাড়ি দেয় দীর্ঘ শ্রান্ত পথ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের সামনের মাঠে জটলা পাকিয়ে আছে অনেক ছেলে মেয়ে, ছোট ছোট করে। এর এক কোনে বসে আছে তাপোস আর মাধবীলতা। মাধবীলতা তাপোসের দিকে জীজ্ঞাসু নয়নে বলল, ‘এলএলবি শেষ করলে, এবার কি করবে?’
‘কি আর করব জাল আর নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে যাব।’
‘তার জন্য এই ডিগ্রীতে হবে না।’
‘তাহলে?’
‘আবার অলাদা ডিগ্রী নিতে হবে।’
‘ওরে বাবারে। আমি আর পড়তে পারব না। আমার এতে চলবে। ওদিকে যাবার দরকার নাই।’
মাধবীলতা তাপোসকে প্রশ্ন করল, ‘সাব-জজের পরীক্ষা দেওয়া যাবে।’
‘তাহলে তো আবেদন করতে হয়।’
‘হ্যাঁ, দুই জনেই আবেদন করব।’
‘মনে কর এবার হয়ে গেলেই দাদাকে বলে তোমার সাথে আমার মালা বদল করে ফেলব।’
মাধবীলতার লাজুক উত্তর, ‘ইস তোমার সাথে মালা বদল করলে তো।’
‘এই যা, এই মেয়ে কি বলে! আমার সাথে তিন বছর প্রেম করে এখন এসব কি বলছে। তা হতে দিচ্ছি না।’
এমন সময় পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছ থেকে এক গোছা লাল সদ্য ফুটন্ত ফুল ওদের সামনে পড়ল। ফুল হাতে তাপোস বলল, ‘এই দেখ, ভগবান খুশি হয়ে দিয়েছেন। এই বিয়ে এবার ভগবানের বাপেও ঠেকাতে পারবে না।’
ওরা এক সঙ্গে হেসে উঠল।
‘কাল আমি বাড়িতে যাব।’ মাধবীলতার মুখ মলিন হয়ে গেল তাপোসের কথায়, ‘তাহলে কয়েক দিনের জন্য তোমাকে দেখতে পাব না।’
‘না বেশি দিন থাকব না। তাড়াতাড়ি চলে আসব।’
‘না না ঠিক আছে তোমার দাদা-বৌদি যেদিন আসতে দেয় সেদিনই এসো। তাদের কষ্ট দিয়ে এসো না। এই জগতে তারাই তোমার অভিভাবক।’
কিছুক্ষণ পর তাপোস মাধবীলতাকে বলল, ‘তোমার হাতটা এদিকে দাও তো।’
‘কেন?’
‘আহা দিয়েই দেখ না।’ মাধবীলতা দুই হাত বাড়িয়ে দিল।
‘শুধু ডান হাত।’ মাধবীলতা ডান হাত বাড়িয়ে দিল।
‘এবার চোখ বন্ধ কর।’ তাপোস পাথর বসানো রুপার একটা আংটি ওর ডান হাতের মধ্যম আঙ্গুলে পড়িয়ে দিল।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে নিরুপমা রান্নাঘর থেকে ভেজা হাত মুছতে মুছতে দরজা খুলতে এলো। ওর শাখা আর চুড়িগুলো চিরাচরিত সেই টুং টাং শব্দে বেজেই চলছে। দরজা খুলে তাপোসকে দেখে নিরুপমা চিৎকার করে উঠলো, 'ডাকাত, ডাকাত।'

'কি আছেটা যে ডাকাত পরবে। ওদেরও লজ্জা-টজ্জা আছে।'

নিরুপমা পথ ছাড়তেই তাপোস ঘরের মধ্যে উঠলো। 'বল বৌদি কেমন আছো?'

'আমার বাপের ভাগ্যি বাবু একথা জিজ্ঞাসা করেছেন। কে রাখে এখবর।'

রাগের ভাব দেখিয়ে তাপোস বলল, 'যাও আর কখনও জিজ্ঞাসা করব না।'

'ওরে বাপ রে বাবুর রাগ দেখ না।' নিরুপমা ওকে টেনে বসিয়ে বলল, 'যাক আর রাগতে হবে না। বস আমি তরকারিটা নামিয়ে আসি।'

অরুণ কলপাড় থেকে গোসল সেরে ঘরে আসল। নিরুপমা বলল, 'গিয়ে দেখ কে এসেছে।'

'কে আবার। প্রদীপ নাকি? আহ ওর জ্বালায় আমি অস্থির।'

'আহা গিয়েই দেখ না।'

তাপোস জামা-প্যান্ট ছেড়ে কেবলই ধুতি পড়ল। অরুণ দরজার কাছে এসে ডাক দিল, 'তাপোস।'

'দাদা, কেমন আছ?' তাপোস দাদাকে জড়িয়ে ধরল। 'আমি ভালো আছি, তুই ভালো আছিসতো? হঠাৎ করে চলে আসলি যে?'

'পরীক্ষা শেষ তাই চিঠি না দিয়েই চলে এলাম।'

'ভালোই হয়েছে। আমি তোকে লিখব লিখব করছিলাম।'

নিরুপমা এসে বলল, 'হাতমুখে পানি ছিটিয়ে আয়। আমি খেতে দেই।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে অরুণ তাপোসকে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি করবি?'

'তুমি কোন চিন্তা কর না। কিছু একটা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

'না না, আমি কোন চিন্ত করছি না।'

সন্ধ্যায় পাখ-পাখালির ডাক যেন বেড়ে গেল। ওরা ঘরে ফেরার সময় যেন সব চেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী যেমন ব্যস্ত হয়ে পরে তেমনি প্রকৃতি নীরব হয়ে পড়ে। পরিবেশ তখন শান্ত কোমল শিশুর মত হয়ে যায়। এই সন্ধ্যার মায়া যে কেউকে প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়।

দূরের মুসলমান পাড়া থেকে আজানের শব্দ আসছে। এসব হিন্দু বাড়ি ও মন্দির থেকে কাঁসার ঘণ্টা ও উলু দেওয়ার শব্দ আসছে। পরম ভক্তিতে হিন্দু বাড়ির বউরা উলু দিয়ে, সিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে পূজা করে। এই সমস্বরের আরাধনা ভগবানের দুয়ারে পৌঁছতে বাধ্য।

ঠাকুর ঘর থেকে পূজাকর্ম সেরে নিরুপমা এই মাত্র বেরিয়েছে। সন্ধ্যায় ও গোসল করে ঠাকুর ঘরে ঢোকে। ভেজা খোলা চুল মাথার কাপড়ের তলে, সিঁথিতে তাজা সিঁদুর। শাড়ির আঁচল মাথার এক পাশ থেকে অন্য পাশে নেমে গেছে। একটা কাঁসার থালায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত, পূজা দেওয়া জবা ফুল, সন্দেশ, মধু ইত্যাদি সাজানো। নিরুপমা ঘরের দিকে আসল।

এই সাঁঝের বেলায় একাগ্রচিত্তে মাধবীলতাকে চিঠি লিখছিল তাপোস। চিঠি লেখা প্রায় শেষ। এমন সময় চুড়ির শব্দে ওর খেয়াল হল। বৌদি আসছে। ও চিঠি লুকিয়ে ফেলল। কিছু লুকানো হচ্ছে এমনটা নিরুপমার চোখ এড়ালো না। নিরুপমা জ্বলন্ত প্রদীপ সমেত কাঁসার থালাটি তাপোসের সামনে বার কয়েক ঘুরিয়ে একটা সন্দেশ ওর মুখে পুরে দিল। ফুলভেজা জল ছিটিয়ে দিল ওর মাথায়।

'কি লুকানো হচ্ছে? আমি দেখে ফেলেছি।'

'কিচ্ছু না। তুমি দেখ নাই।'

'যত বড় ডাকাতই হোস না কেন আমার চোখ ফাঁকি দেওয়া এত সহজ না।'

তাপোস মুখে ভেংচি কেটে বলল, 'ফাঁকি দেওয়া সহজ না ছাঁই। ইস মহারাণী।'

'প্রেমপত্র বুঝি?'

'হু, দাদার প্রেমপত্র।'

একথা, শুনে নিরুপমা আর দাঁড়াল না। তাপোস উচ্চস্বরে হেসে বলল, 'কি হলো চলে গেলে কেন? দেখবে না।'

এর বছরখানেক পরে তাপোস সাব-জজ হয়ে পিরোজপুরে যোগদান করল। মোটামুটি ভালোভাবেই দিনকাল যাচ্ছে। তাপোস মনস্থির করল দাদাকে বলে এবার মাধবীলতার সাথে বিয়ের পাট চুকে ফেলবে।

একদিন মধ্যাহ্নে অফিসে খবর আসল যে, তাপোসের দাদার খুব অসুখ। আজই যেন তাপোস বাড়িতে যায়। ঐ সময়ই অফিস থেকে তাপোস খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওর দাদার একটা শক্ত অসুখ হয়েছে। ডাক্তার জানিয়েছে আর বেশি বাঁচার আশা নাই।

অরুণ হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। চোখ বন্ধ করে। তাপোস দাদার পাশে বসে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগল। অরুণ চোখ মেলে তাকাল। তাপোসকে উদ্দেশ্য করে কাঁপা গলায় বলল, 'এই বোকা কাঁদছিস কেন? সব ভগবানের ইচ্ছে।' ক্ষণিকের জন্য নিরুপমা কোথায় যেন সরে গেছে। অরুণ এই ফাঁকে তাপোসকে বলল, 'আমরা ছিলাম অনাথ, ভগবান ঠাঁই দিয়েছেন। ছিলাম গরীব কুমার। ভগবান জুয়েলারির ব্যবসা দিলেন। আমি আর বেশি দিন বাঁচব না, ডাক্তার বলেছে। নিরুপমা জানে না, ওকে বলিস না। ভগবান তোকে অনেক সম্মান দিয়েছেন। তুই ভালো চাকরি করিস আমার আর চিন্তা নাই। আমার একটা কথা রাখবি।'

'বলো দাদা, একটা নয় হাজারটা রাখবো।'

'আমি মরার পর নিরুপমাকে বিধবার শাড়ি জড়াতে দিস না। তুই ওকে বিয়ে করিস। ওকে আমার জন্য ত্যাগ করতে হয়েছে অনেক। আমাকে কথা দে।' অরুণ তাপোসের হাত দুখান বুকের ভিতর জড়িয়ে নিল। ওর গলাটা ধরে এলো। তাপোস কাঁদছে শিশুদের মত ডুকরে। 'হ্যাঁ, দাদা তাই হবে।'

সপ্তাহ বাদে অরুণ কুমার চিরদিনের জন্য স্বর্গবাসী হল। বড় ভাই অরুণকে চিতায় শুইয়ে মুখে আগুন দিল তাপোস। মাস দুইয়ের বেশি নিরুপমাকে বিধবা হয়ে থাকতে হয় নাই।

মাথার সিঁথিতে রাঙা সিঁদূর দিয়ে গলায় মালা জড়িয়ে নিরুপমাকে অরুণের কথা মত নিজের স্ত্রী করে নিল তাপোস। অরুণহীন নিরুপমা এখন পরম আশ্রয়ে তাপোসের বুকে ঠাঁই নিয়েছে। ভালোবেসে অরুণকে বিয়ে করে, অরুণই নিরুপমার পৃথিবী। অরুণহীন জীবন খুব নিশ্চুপ ও নিঃশব্দে হয়ত কাটিয়ে দিত নিরুপমা। কিন্তু অরুণের অনুরোধ তা আর হতে দিল না। নিরুপমা অরুণের ইচ্ছাকে বাস্তবতায় রূপ দিল। তাপোসের হাত ধরে বাকি জীবন চলতে হবে নিরুপমাকে, এই ছিল অরুণের ইচ্ছা।

শেষ রাতের দিকে তাপোস উঠে গিয়ে চেয়ারে বসল। নিরুপমা খাটে চিত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। লাল বেনারসি শাড়ি পরে আছে ও। সিঁদুর মাখা সিঁথি মাথার লম্বা কালো কেশকে দুই ভাগে ভাগ করে বালিশের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমের ভিতরই ওর চোখ কাঁপছে অনবরত। বিশাল ধাক্কা সয়ে উঠে নিরুপমা যেন অর্ধেক হয়ে গেছে। শাখা-চুড়ি পরিহিত হাত দুখান আলতোভাবে পেটের ওপর পড়ে আছে। নিঃশ্বাসের তালে হাত দুখানি ওঠানামা করছে।

কাল নিরুপমাকে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে তাপোসের। তাপোস মাধবীলতাকে চিঠি লিখতে কাগজ নিয়ে বসল। তাপোস কিভাবে মাধবীলতাকে চিঠি লিখবে। যাকে ও কথা দিয়েছিল কিন্তু কথা রাখতে পারে নাই, তাকে কোন সাহসে চিঠি লিখবে। কিন্তু লিখতে হবেই। মা-বাবার স্নেহ পাওয়া দাদাকে ও বিমুখ করতে পারে নাই। নিরুপমাকে বিয়ে করে তাকে ও সমাজে সন্মানের সহিত সমাসীন করেছে। মাধবীলতা না হয় কষ্ট পেয়ে হৃদয় ভাঙ্গা ব্যথানিয়ে অন্য কাউকে বেছে নেবে। তাপোস হৃদয়ের ব্যথার দুয়ার বন্ধ করে মাধবীলতাকে চিঠি লিখতে বসল।

সুহৃদয়াসু মাধবীলতা,

১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ,
একটু ছায়া, খুলনা।

আমার নমস্কার নিও। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছো। বিশেষ কারণ বশত আমি বহু দিন তোমাকে লিখতে পারি নাই। দুটি সংবাদ জানিয়ে এই চিঠি। প্রথমটা আমার দুঃসংবাদ। পরেরটা সুসংবাদ নাকি দুঃসংবাদ তা আমার অজানা।

সময়ের সঙ্গে জীবনকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সময় এগিয়ে চলে-জীবনও এগিয়ে চলে। জীবনের প্রয়োজনেই মানুষকে ছুটে যেতে হয় দূর-দূরান্তে। কয়েক দিন হলো আমার দাদা স্বর্গবাসী হয়েছেন। তার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থণা কর। পরের সংবাদ কি লিখব আমার কলম জড়িয়ে যাচ্ছে। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি সারা জীবনের জন্য তোমার কাছে অপরাধী হয়ে গেলাম। মৃত্যুর আগে দাদার অনুরোধ ছিল, আমি যেন তার মৃত্যুর পর বিধবা নিরুপমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে স্ত্রীর মর্যাদা দেই। আমার পথ চলতে শেখানো দাদার অনুরোধ আমি ফেলতে পারি নাই। তোমার কাছে আমার দেওয়া কথা আমি রাখতে পারি নাই। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও এটাই আমার শেষ চাওয়া। সুখে থেকো, ভালো থেকো এই কামনা করি। তোমার ভালোবাসার

তুলনা আমার জানা নাই। সাগরের মত বিশাল এর পরিধি। ঐ ভালোবাসা পাওয়া আমার আর হল না। আর একজন তার ভালোবাসা দিয়ে আমায় পূর্ণ করতে চাইছে। এটাই তোমার কাছে আমার শেষ চিঠি। তোমার ভালোবাসর প্রতি আমার চিরদিন শ্রদ্ধা থাকবে। ভালো থেকো।

ইতি প্রীতিমুগ্ধ,
তাপোস কুমার।

রাতের শেষ প্রহর। ৮ কার্তিক, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।
৩৯৭ কবি আহসান হাবীব সড়ক, পিরোজপুর।

অপেক্ষা

ফজরের আযান হচ্ছে চার দিকে। রাত শেষ বহু আগেই তারপরও অন্ধকার ঝেঁকে আছে। হামিদা বিছানা থেকে মশারির ভিতর দিয়ে মাটির মেঝেতে খালি পা রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোনে রাখা হারিকেন আরও একটু উসকে দিল। তারপর তার বিছানায় শুয়ে থাকা মাহফুজাকে ডাকলও।

'মাহফুজা, ওঠ ফজরের আযান হয়ে গেছে।'

মাহফুজা পাশ ফিরে আবারও ঘুমাতে লাগল। হামিদা আবার ডাকতেই, 'ভাবী, আর একটু। এই উঠছি তুমি যাও।'

এরপর পাশের ঘরে এসে শাশুড়িকে ডেকে তুলল হামিদা, 'আম্মা, আম্মা।'

'কেডা? বউ।'

'আম্মা ফজরের আযান হইছে ম্যালা সময়।'

তারপর ধীরে ধীরে শ্বাশুড়ী ফাতেমা বেগম উঠে বসলেন। স্বামীকে ডেকে তুললেন। বউ-শ্বাশুড়ী গেলেন পুকুরের দিকে। ঘরের দরজায় হারিকেন রেখে। চারপাশে আলো নিবু নিবু অবস্থা। আকাশটা অনেক পরিষ্কার তবে চারধারে এখনও অন্ধকার। হামিদা আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল মুহূর্তের জন্য। ফাতেমা বেগম ওযু শেষে ঘাট থেকে উঠে বউকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বউ, লও ঘরে যাই।' হামিদা আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। কয়েকবার শ্বাশুড়ির কথার পর সম্বিৎ ফিরে পেল।

'লন আম্মা। ঐ তারাডা কিসের আম্মা ?'

পূর্বাকাশে একটা তারা দেখিয়ে বলল হামিদা। ফাতেমা বেগম ঐ তারাটার দিকে তাকিয়ে ব্যথিত নয়নে পুত্রবধুর দিকে তাকালেন। নিজের মনের ব্যথা যে, পুত্রবধুর মনের ব্যথার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এটা কীভাবে তিনি ওকে বুঝাবেন। নরম সুরে বললেন, 'বউ নামাযের সময় তো শ্যাষ অইয়া যাবে। লও ঘরে লও।' হামিদা আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে শ্বাশুড়ির সাথে ঘরে আসল।

পাশাপাশি দুইটা নামাযের হোগলা পেতে নামায পড়ল বউ-শ্বাশুড়ি। নামাযের পর তারা কোরআন পড়ল কিছুক্ষণ। শেষে হামিদা হাত তুলল আল্লাহর কাছে। চোখের পানি ছেড়ে মনে মনে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকল, 'হে আল্লাহ তুমি আমারে মাফ কইরা দেও। মোর স্বামীরে মোর কাছে ফিরাইয়্যা দাও। আমি আর কতদিন পত চাইয়্যা থাকমু। আমারে তুমি মাফ কইরা দেও লগে মোর স্বামীরেও। মোগো সবাইরে তুমি মাফ কইরা দেও।'

হামিদা নামাযের হোগলা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবারও খালি পায়ে নামল মাটিতে। এই নামা যে তার একটানা দুপুরের গোসল পর্যন্ত। হামিদা রান্না ঘরে গিয়ে চুলায় চায়ের পানি দিয়ে রুটি বানাতে লাগল শ্বশুরের জন্য। শ্বশুর মসজিদ থেকে এসেই আবার নাস্তা করবেন। তখন মাহফুজা হাতে পাউডার নিয়ে, দাঁত ঘষতে ঘষতে যাচ্ছে পুকুর ঘাটের দিকে। হামিদা ডাকল ওকে,

'নামায পড়লা না যে?'

'এই তো ওঠতে এ্যটটু দেরী ওইল।'

'মুই তো তোমারে বোলাইলাম।'

মাহফুজা মলিন মুখে হামিদাকে বলল, 'আব্বারে কইও না।'

'কিন্তু মিত্তা কতা কওয়া কি ঠিক অবে।'

'কাইল হইতে ঠিক কইরা নামায পড়মুআনে।'

'ঠিক আছে মনে থাকে যেন। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া আও।'

মাহফুজা চলে গেল ঘাটের দিকে।

ওয়াদুদ মোল্লা মসজিদ থেকে বের হলেন। ফজরের নামাযের পর উনি মুসল্লীদের সাথে তালিম করেন। চারদিকে সূর্যের আলো হালকাভাবে ছড়িয়েছে এখন। উনি বাড়ির পথে হাঁটা ধরলেন। উনি একটা বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। অবসর নিয়েছেন আজ প্রায় পাঁচ বছর হল। আজ পয়ষট্টি বছর ধরে বাস করছেন ওনার বাপের ভিটায়। উনারা পাঁচ ভাই। কলাখালী গ্রাম। ওয়াহেদ মোল্লার দুই ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলে সাবির। লেখাপড়া তেমন হয় নাই ওর। নিজেদের জমিতে গৃহস্থের কাজ করে ও। তারপর মেজটা মেয়ে, মুরসিদা গ্রামের মাদ্রাসা থেকে ফাজিল পাশ করেছে। সাজেদ সেজ, লেখাপড়া হয় নাই বলে বড় ভাইয়ের সাথে কাজ করে ও। বড় বোনের মাদ্রাসায় পড়ছে মাহফুজা। সবার ছোট ফরিদা। বছর

তিনেক পরে দাখিল পাশ করবে। মোটামুটি এই গ্রামের এক স্বচ্ছল পরিবারের কর্তা ওয়াদুদ মোল্লা। তিন বছর হল সাবিরকে বিয়ে দিয়ে হামিদাকে ঘরে এনেছেন। বড় মেয়েটারও বিয়ে দিয়েছেন জেলা সদরে। এভাবেই ভালো চলছিল ওয়াদুদ মোল্লার সংসার, কিন্তু বাধ সাধল সাবিরের দুবাই যাওয়া নিয়ে।

ওয়াদুদ মোল্লা বাড়ির সামনের উঠোন পেড়িয়ে ঘরের পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন। তাকে দেখে হামিদা রান্না ঘরের দরজায় এসে ডাক দিল, 'আব্বা।'

ওয়াদুদ মোল্লা পিছনে ফিরে ঘুরে তাকালেন।

'কি, মা?'

'নাস্তা অইছে, আমনে খাওয়ার ঘরে যান। আমি লইয়া আই।'

'আমার এহন খাইতে ইচ্ছা করতাছে না, পরে দিও।'

'কিন্তু পরে যে, ঠান্ডা অইয়া যাবে, আমি লইয়্যা আই।'

ওয়াদুদ মোল্লা কোন কথা বললেন না। চলে এলেন খাবার ঘরে। খাবার টেবিলে তিনি নাস্তা করছেন। হামিদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি খাইছ?'

'না, একটু পরে খাব।'

'তোমার শ্বাশুড়ি খাইছে।?'

'না, আম্মা পুরান বাড়ী গেছে, একটু পরে আইবে।'

সাজেদ সকালের আহার সেরে কেবল মাত্র উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে কাছারি থেকে খোন্তা, কোদাল নিয়ে ভাবীকে ডাকল, 'ভাবী কাছিডা দেও দেহি।'

'কাছিডা গরু ঘরে আছে ভাই।'

হামিদা পুকুর ঘাটে থালা মাজছে ছাঁই দিয়ে। স্টিলের থালার সাথে তার চুড়ির আঘাত লাগছে ঘনঘন। চুড়ির শব্দ পুকুর ঘাটের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছে বারবার। হামিদা পুকুর থেকে থালা বাসন ধুয়ে ঘরের দিকে যাচ্ছে। মাহফুজা বইখাতা বুকে নিয়ে বের হয়েছে মাদ্রাসার উদ্দেশ্যে, 'ভাবী, আমি মাদ্রাসায় যাই।'

'আইচ্ছা।' মাহফুজাকে বলল হামিদা। মাহফুজা চলে গেলে রাস্তার দিকে।

সূর্য এখন অনেকটা উপরের দিকে উঠে গেছে। তেজটাও অনেক। তারপরও মৃদু বাতাস গায়ে লাগলে সূর্যের আঁচ মনে হয় না। বাতাসে কেমন যেন একটা কোমলতা আছে। শীতের শেষে বসন্ত এসেছে বুঝি। হামিদার এখন আর সাল ঠিক থাকে না। কখন শীত আসে তার হিসাব নাই ওর। এখন হয়ত বসন্ত এসেছে। একদিন এই বসন্ত চলে যাবে। এসবের হিসাব রাখতে ইচ্ছে করছে না হামিদার। ওর চোখ ভরে গেল নোনা পানিতে। হামিদা সাবিরহীন জীবন যাপন করছে। কেমন আছে সাবির।

বোরখা খুলতে খুলতে বাড়ির পিছনের বাগান থেকে আসছেন ফাতেমা বেগম। হামিদাকে রান্না ঘরের মাটির সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখে বললেন, 'খাইছ বউ?'

পিছন ফিরে শ্বাশুড়িকে দেখে হামিদা উঠল, 'না খাই নাই, আমনের লাইগগা বইয়া রইছি।'

'লও, লও আবার রান্ধন চড়াইতে অইবে।'

বউ-শ্বাশুড়ি খাচ্ছে রান্না ঘরে হোগলায় বসে।

'কাইল আবারও ধান সিদ্ধ করতে অবে বউ। শিকদার বাড়ির ধারে ভুইডার ধান কাডা আইজই অইয়া যাবে।' বললেন ফাতেমা।

'হেলে তো বিয়ালেই ধান ভিহজাইতে অবে।' শ্বাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে বলল হামিদা।

'না ভিজাইয়্যা পারা যাবে। ভিজন ছাড়াই সিদ্ধ করতে অবে।'

জোহরের আযানের কিছু আগে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে হামিদাকে ডাকলেন ওর বাবা সোলায়মান, 'হামিদা, হামিদা।' বাবার ডাক শুনতে পেয়ে হামিদা রান্না ঘর থেকে ছুটে আসলো সামনের দরজায়।

'আব্বা, তুমি।'

'কেনরে মা, আইতে নাই বুঝি?'

'মুইতো হেই কতা কই নাই।'

'দরজা থেকে নেমে হামিদা বাপের হাত থেকে ব্যাগটা নিল।'

'বহু দিন তোরে দেহি না মা, তোর মায় তো তোর লাইগগা অস্থির। তোরে নেতে আইছি।'

'আগে ঘরে ওডো, পরে দ্যাহা যাবে।'

ঘরের বেড়ার ওপাশে দাঁড়ানো ছিলেন ফাতেমা বেগম। তিনি তার বেয়াইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আসসালামুআলাইকুম বেয়াই। কেমন আছেন?'

'ওয়ালাইকুমআসসালম, ভালোই আছি। কেমন আছেন আমনেরা?'

'আমাগো আর থাহা, আমনে তো এ বাড়ির পথ ভুইলাই গেছেন।'

'বাড়ির কামকাজে ব্যস্ত থাহি। সময়ই অয় না। ভুইলা যাই নাই, যে বাড়ি আমি মাইয়্যা দিছি হে বাড়ি ভুইলা গেলে তো আর অয় না।'

ইতিমধ্যে হামিদা কয়েকটা প্লেটে করে আপেল, মিষ্টি ও গ্লাসে করে সরবত নিয়ে এলো। হামিদাকে উদ্দেশ্য করে সোলায়মান বললেন, 'মা এই দুহারে, এগুলো না অইলে তো ভালো অয়।'

'না, আব্বা এ্যটটু হালকা নাস্তা কর।'

এই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করলেন ওয়াদুদ মোল্লা। তিনি বেয়াইকে দেখে বললেন, 'বেয়াই, আসসালামুআলাইকুম। আমাগো মনে রাখছেন হেলে।'

'ওয়ালাইকুম ...। আমনেগো মনে না রাইখা কোতায় যামু।'

মসজিদে যোহরের নামায আদায় করে বের হলেন দুই বেয়াই ওয়াদুদ মোল্লা ও সোলায়মান। সোলায়মান বললেন, 'হামিদার মায় ওরে খুব দেকতে চায়। আমি ওরে নেতে আইছি।'

'আসলে আমাগোর কফাল খারাপ। আমরা হামিদার জীবনটাই নষ্ট কইরা দিলাম গো বেয়াই।' ওয়াদুদ মোল্লার চোখ ছলছল করছে। গলাটা ভারি হয়ে গেল।

'না বেয়াই, সব আল্লাহর ইচ্ছা। মোরা তো আর কিছু করি নাই।'

কতক্ষণ থামার পর সোলায়ামান জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাবিরের কি অবস্থা? কিছু কি হরতে পারলেন?'

'তদবির চালাইতে আছি দেহি আল্লায় কি হরে। ভালো একজন উকিল দেতে তো ম্যালা টাহা পয়সা লাগে। যতদূর পারছি দেতে আছি। কেস এহন হাইকোর্টে গেছে।'

'শীঘ্রিরি কি দ্যাখতে গেললেন, ওরে?'

'গত বিশ তারিখ গেললাম বরিশাল। পোলাডার মুখ একদম হুগাইয়া গেছে।'

কতক্ষণ পর সোলায়মান বললেন, 'মোর মাইয়াডার এরহম জীবন তো আর চলতে দেয়া যায় না, বেয়াই।'

ওয়াদুদ মোল্লা উত্তর দিলেন, 'মোরা হামিদারে তো কই, কিন্তু ওতো এ বাড়ি ছাড়তে চায় না, দ্যাহেন আমনের মাইয়ায় যাইতে চাইলে লইয়া যান, মোগো কোন আপত্তি নাই।'

সোলায়মান আসরের পর এখন যাচ্ছেন বাড়ির দিকে। সবাই আজকে থাকতে বললেও থাকছেন না তিনি। বাড়িতে অনেক কাজ নাকি পড়ে আছে। বেয়াই বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোলায়মান চললেন। পিছনে পিছনে বাপকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে হামিদা।

'মা, তুই আমার কতা আরও ভাইবা দেখ, মোরা সবসময় তোর ভালো চাই।'

'আব্বা, মুই ভাবাভাবি আর করতে পারমু না। মুই আমনের জামাই আর এ বাড়ি থুইয়া কোতাও যামু না। এই বাড়ির দুঃসময় যদি চইলা যাই হেলে সুহের দিনে থাহা যে অন্যায়।'

'কিন্তু মা, সাবিরের জীবনের তো নিশ্চয়তা নাই।'

'জানি না।' বলেই ডুকরে কেঁদে উঠলো হামিদা। একটু সময় নিয়ে মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে সোলায়মান বললেন, 'ঠিক আছে, তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যামু না। ভালো থাহিস, আসি।'

'মায়রে কইও আমি কয়দিন পর আমু আনে। মায়রে চিন্তা হরতে মানা হইরো।'

রাতে খাবার-দাবারের পর শোবার আগে হামিদাকে ডাকলেন ওয়াদুদ মোল্লা। খাটের উপর আসন করে বসে আছেন ফাতেমা বেগম। পা ঝুলিয়ে বসে আছেন ওয়াদুদ মোল্লা। ঘরের এক কোনে একটা হারিকেন মিটটিম করে জ্বলছে।

দরজায় পর্দা ঠেলে মুখ বের করে হামিদা বলল, 'আমারে বোলাইছেন আব্বা?'

'হয়। আও।'

ওয়াদুদ মোল্লা উঠে গিয়ে খাটের এক কোনায় বসলেন, 'আও বউ।' খাটের এক কোনা দেখিয়ে বললেন ওয়াদুদ মোল্লা।

ফাতেমা বেগম বললেন, 'বউ তোমারে বোলাইছি একটা কতা কইতে।'

ভয়ে ও সংকোচে শ্বাশুড়ির চোখের দিকে তাকিয়ে হামিদা বলল, 'মা মোর কি কোন অফরাধ অইছে?'

'না, মা তোমারে দিয়া এরহম কাম কোন দিন যে অবে না হেয়া জানি।'

ঘরের কোনায় হাওয়ার তালে দোল খাওয়া বাতির দিকে তাকিয়ে আবারও হামিদার দিকে তাকালেন। হামিদাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই সংসারের জন্য তুমি আর কত হরবা, তোমার নিজেরও তো একটা জীবন আছে। এরহম জীবনডারে নষ্ট কইরা দিও না। তুমি বাড়ি যাও। নতুন কইরা সংসার কর।'

'মা, আমার স্বপ্ন যে এ সংসার লইয়া। এয়া যে ভাঙ্গা যাবে না। মোর জীবন তো নষ্ট অয় নাই। এইডাই তো মোর জীবন। একজনের এক রহম আরেক জনের আরেক রহম। মোরডা এ্যটটু আলাদা।'

এবার ওয়াদুদ মোল্লা কথা বললেন, 'কিন্তু তুমি যারে লইয়া সংসার করবা হের জীবন যে আইজ অনিশ্চিত। ও কি কোন সময় আবে কিনা হেয়াও মোরা কেউ জানি না।'

'আব্বা, সুখের দিনে থাকতে পারলে কির লইগ্যা দুখের দিনে থাকতে পারমু না। আমনের পোলারে যে আমি কইছিলাম হারাজীবন এই সংসারের সবার মুখে হাসি রাখমু। এই বাড়ি থুইয়া মোরে যাইতে কইয়েন না, মুই থাকতে পারমু না।' বলেই হামিদা হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল, অঝোর ধারায়। হামিদা কাঁদছে, ফাতেমা বেগমও কাদঁছেন। ওয়াদুদ মোল্লার চোখেও আজ পানির উপস্থিতি দেখা গেল। এ যেন কান্নার মেলা বসেছে। ফাতেমা বেগম হামিদাকে বুকে টেনে নিলেন।

'মা তোর মত মাইয়া যে হাজারে এটটা পাওয়া যায় না। তোরে জম্ম না দিয়াও আমি তোর মা।' আরও কতক্ষণ বউ-শ্বাশুড়ির কান্নার আসর চলল।

হামিদা আস্তে আস্তে মশারির ভিতর ঢুকে শুয়ে পড়ল। মাহফুজা ডাকল, 'ভাবী।' মনে হয় ও জেগেই ছিল।

'কি এহনোও ঘুমাও নাই।'

'ভাবী দাদা কি ছাড়া পাবে, দাদা কি আবার বাড়ি আবে।'

'আইবেরে বোন। আমার মন কইতেছে জলদিই আইবে। তোমার কি মনে অয়?'

'আমারও মনে হয় দাদা খুব জলদি আইবে। উডানে খাড়াইয়া আমারে বোলাইবে।'

'কেমনে মনে অইল।'

'তোমারে দেইখা। তুমি প্রতিদিন দাদার লাইগ্গা বইয়া থাহ। মোর খুব কষ্ট অয়।'

এই ভাবে দুই ননদ-ভাবীর মধ্যে কথা চলল অনেক সময়। এক সময় দুইজন দুইজনকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্ষেত থেকে ফিরছে সাবির। খোন্তাটা গোয়াল ঘরের সাথে হেলান দিয়ে রাখল। কোদালটাকে ধপাস করে মাটিতে ফেলে হামিদাকে ডাকতে ডাকতে ঘরের পিছনের দিকে আসল, 'হামিদা, হামিদা।'

চারদিকে সুনসান নীরবতা। কিছুটা বিরক্ত হল সাবির। কাউকে কোথাও না পেয়ে চলে এল পুকুর ঘাটে। পুকুরে সাঁতড়িয়ে গোসল করছে হামিদা। কাপড়টা পানিতে ভেসে আছে। ওর খোলা চুল পিঠের ওপর পানির ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। হামিদাকে অল্প কিছুক্ষণ দেখল সাইফুল। ওকে দেখলে হামিদা লজ্জা পাবে ভেবে ওখান থেকে চলে গেল সাইফুল।

মেইয়ের পাশে গরুর জন্য খড় কাটতে দেখে হামিদা সাইফুলকে বলল, 'কখন ফিরলা?'

'এইতো বেশী সময় অয় নাই।'

'নাইয়া আও, আমি ভাত দেতে লাগছি।'

হামিদা উঠোনের দড়িতে ভেজা কাপড়গুলো শুকাতে দিচ্ছিল। সাবির তাকিয়ে আছে হামিদার দিকে। হামিদার ভেজা চুলে লাল একটা গামছা পেঁচানো। হামিদা ভালোই কুচি দিয়ে শাড়ি পড়তে পারে। সমস্ত শরীর কি সুন্দরভাবে ঢেকে রাখে ও। হামিদার স্যান্ডেলহীন ভেজা সাদা পায়ের পাতায় আপনভাবে মাটি লেগে আছে, দেখে সাইফুলের খুব হিংসা হচ্ছে। কাপড় নাড়া শেষে হামিদা পিছনে ফিরে সাবিরের দিকে তাকাল। সাবির যেন ঘোরের মাদকতায় ছিলো। হামিদা ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞাসু নয়নে বলল,'কি?'

'না, কিছু না।'

কপালে ভাঁজ ফেলে হামিদা বলল, 'তোমরা পুরুষ জাতটাই খারাপ, মাইয়া দেখলে খালি চাইয়া থাহো।'

'আমি ছাড়া আর কেউ চায় নাকি তোমার দিকে?' সাবির উত্তর করল।

'না তোমার লগে কতা কওয়াই অন্যায়।' হামিদা রাগান্বিত হয়ে চলে যেতে লাগল। পিছন থেকে সাবির ডাকল,

'বউ খাড়াও, খাড়াও।'

হামিদা আর দাঁড়াল না। সাইফুল হাসতে হাসতে গামছা নিয়ে খালের দিকে গোসল করতে গেল।

রাতে ঘুমানোর সময় সাবির বলল, 'সবকিছু রেডি বউ। পরশু সিলেট যামু। ঐহানে মাস খানেকের ট্রেনিংয়ের পর বাড়ি থাকমু দশ দিন। হের পর সোজা দুবাই।'

'দুবাই না গেলে কি অইতো না।' স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল হামিদা।
'বউ, তিন বছর দুবাই থাহার পর কিছু টাহা অইলে বাড়ি আইয়া একটা ব্যবসা হরমু। মোগো এক সময় বহুত টাহা অবে।'
'আমরাতো ভালোই আছি। আমাগো দিনতো ভালোই যায়।'
'আমি তো তিন বছর পর আমু। আমার লইগ্গা তিন বছর কষ্ট করতে পারবা না বউ!'
'তোমার লইগ্গা তিন বছর না, ত্রিশ বছরও থাকতে পারমু আমি।'

আজ সকালে সাবির যাচ্ছে সিলেটের উদ্দেশ্যে। হামিদার এক ফুফাত ভাই এসেছে। সাবির ওর সাথে দুবাই যাবে। এখন দুইজন সিলেট যাবে ট্রেনিং করতে। যাতে ঐখানে গিয়ে প্রথম ঝামেলায় পড়তে না হয়। এ সংক্রান্ত সকল কাজই হামিদার ফুফাতো ভাই করে দিয়েছে। যাবার আগে হামিদা সাবিরকে জড়িয়ে ধরে সেকি কান্না।
'কি, এত ক্যান্দ ক্যান, মুই আবার আমু তো। পরে এহান দিয়া দুবাই যামু। তুমি এত কানলে মোর তো যাইতে ইচ্ছে করবে না।' হামিদা কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে বলল, 'নিজের দিকে খেয়াল রাইখো।'
তারপর একে একে মা, বাবা, ভাই, বোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাবির চলল সামনের রাস্তার দিকে। এই কাঁচা রাস্তা দিয়েই বিভিন্ন ভাবে যাওয়া যায় বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তে এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে। ওরা প্রথমে পিরোজপুর যাবে। সেখান থেকে গাড়িতে করে সরাসরি ঢাকা। তারপর সিলেট। ওদের ঢাকা পৌঁছতে সন্ধ্যা হল। ওরা ঢাকায় সায়েদাবাদ থেকে বাসে করে সিলেটের উদ্দেশ্যে রওনা হল। রাত আটটার দিকে বাস একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়ালে ওরা ঐখানেই রাতের খাবার খায়।

মিনিট তিরিশের পর আবারও ওদের যাত্রা শুরু হয়। সাবির আর ওর শালাটি গভীর ঘুমে অচেতন। রাত একটার দিকে ওদের গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। কয়েকজন বিডিআর সদস্য উঠলেন গাড়ির ভিতরে। গাড়ির ভিতরে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বিডিআর সদস্যরা যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করা শুরু করলেন। এক পর্যায়ে সাবিরের পালা। ওর শালা ভয়ে একদম কুঁকড়িয়ে গেল। সাবিরদের মাথার উপরে রাখা একটা ব্যাগ দেখিয়ে বিডিআরের এক সদস্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ব্যাগটা কার?'
শালার ব্যাগ দেখে সাবির বলল, 'আমাগো ব্যাগ।'
ব্যাগটা খুলে ধীরে ধীরে তল্লাশি শুরু হল। এক সময় ময়দার প্যাকেটের মত পাঁচটা বড় সাইজের প্যাকেট পেল বিডিআর। তারা সাবিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি এটা?'
'মুই তো জানি না।'
একটা প্যাকেট ছিড়ে এক বিডিআর সদস্য আঙ্গুলে করে একটু মুখে নিয়ে বললেন, 'এটা কি জান না! এবার জানবে। নিয়ে চল এদেরকে।'

সাবির আর ওর শালাকে হাতকড়া পড়ানো হল। ওদেরকে তোলা হল বিডিআর ভ্যানে। সাবির বুঝল না কি অপরাধ তার। ও জানে হিরোইন খুব খারাপ জিনিস। তবে সারাজীবন শুধু এর নামই শুনেছে কোনদিন দেখতে পায়নি নিজের চোখে। আজ দেখছে এমন দেখা যে তাতে একদম জেলেই যেতে হচ্ছে ওদের। সাবির ভাবল, যে ব্যাগে ওগুলো ছিলো তা তো ওর ব্যাগ না। ওটাতো ওর শালার ব্যাগ। ওকি সত্যিই এটা এনেছিল? কেন এনেছিল ওটা?

এর দুই দিন পর কেউ একজন সাবিরের বাড়িতে এসে খবর দিল যে, সাবিরকে বিডিআর ধরেছে। এখন ও সিলেট জেল হাজতে আছে। সাবিরের বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কির লাইগগা ধরছে, কি হরছে সাবির?' কিন্তু লোকটি কোন সদুত্তর করতে পারলো না। এই খবর শুনে হামিদা অজ্ঞান ছিল টানা আট ঘণ্টা। জ্ঞান ফিরলে ও জানতে চায় সাবির কোথায়? কেন ধরছে ওকে? হিরোইন কি? এটা দিয়ে কি করা হয়? ইত্যাদি।

ওয়াদুদ মোল্লা ওইদিনই রওনা হলেন সিলেটের উদ্দেশ্যে। পরদিন সন্ধ্যায় উনি পৌঁছলেন সিলেট কোতয়ালী থানায়। ওসি সাহেব জানালেন কোর্টে চালান করার পর ও এখন জেল হাজতে আছে।
'ক্যামনে দেহা করমু ওর লগে?' উদ্বিগ্ন স্বরে ওয়াদুদ মোল্লা জিজ্ঞাসা করলেন।
ওসি সাহেব ঠাট্টার সুরে বললেন, 'বসেন একটু হিসাব নিকাশ করি আপনার সাথে। আমি দেখা করার ব্যবস্থা করে দেব।'
'কি হরছে ও?'
'ওদের কাছে দশ কেজি হিরোইন পাওয়া গেছে।'
'কিন্তু ওতো হিরোইন চেনেই না।'
'এটা তো কোর্ট বিশ্বাস করবে না! দশ কেজি হিরোইন মানে বোঝেন দশ-বারো কোটি টাকার কাছাকাছি।'
'বারো কোটি!' বিস্ময় ও আতঙ্কের গলায় বললেন ওয়াদুদ মোল্লা।

'ঘাবড়ে গেলেন?'
'আমি বিশ্বাস করি না। ও একাম করতে পারে না।'
'আপনাকে বিশ্বাস করতে কে বলেছে মশায়?'
'কালকে আবারও কোর্টে তোলা হবে ওকে। রিমান্ড চাওয়া হবে।'
রিমান্ড মানেই পাশবিক নির্যাতন, কত নির্মম। ওয়াদুদ মোল্লা আঁতকে উঠলেন।
'আঁতকে উঠলেন যে মশায়। অবশ্য রিমান্ড না হওয়ার জন্য একটা পদ্ধতি আছে।'
একটু যেন ভরসা পেলেন ওয়াদুদ মোল্লা, 'কি পদ্ধতি এইডা?'
'হাজার পঞ্চাশেক টাকা দেন।'
'বোঝেনইতো বিশাল কেস। পরে দফায় দফায় আরো লাগবে।'
'কিন্তু এই বিদেশে এত টাকা আমি কোতায় পামু?
'দেখেন কি করবেন। আমি আবার ব্যস্ত মানুষ, এবার আসেন।'

আজ এক বছর হল সাবির জেল হাজতে। ওর জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হচ্ছে ওয়াদুদ মোল্লাকে। রিটায়েটমেন্টের যা টাকা ছিলো সব। জমিও বিক্রি করেছেন অনেক। বিভিন্ন জায়গায় টাকা দিতে হয় ওনাকে। থানায়, আদালতের মুহুরী, উকিলদেরকে দিতে দিতে উনি এখন নিঃস্ব প্রায়। এই বুড়ো বয়সে ওনার কি এটাই প্রাপ্য ছিল? সারাক্ষণ দুঃশ্চিন্তায় থাকেন উনি। এত শান্তির ভিতরে অশান্তি হল দুবাই যাওয়াকে কেন্দ্র করে। কেন যে উনি দুবাই যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন সাবিরকে, নিজের উপর নিজেরই রাগ হচ্ছে এখন।

সাবির জেলখানার বড় জানালার ভিতরে শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আজ খুব করে হামিদার কথা মনে হচ্ছে ওর। আজ এক বছর হল ও এই হাজতে। কাল ওর রায় হবে। এর মাঝে কত বার ওকে নির্যাতন করা হয়েছে। চেয়ারে বেঁধে পিটানো হল। ইলেকট্রিক শক দেয়া হল। ওর প্রসাব নলিতে আজও ব্যথা করছে। বালতিতে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে প্রসাব করতে বলা হয়েছিলো ওকে। তারপর যে কি যন্ত্রণা। হাতের আঙ্গুলের ভিতর সুঁচ ফুটান হল অনেকবার। ও হাতের দিকে তাকাল, এখন আর নক কাটতে হয় না। কারণ হাতের নকগুলো প্লাস দিয়ে টেনে তুলে ফেলা হয়েছে। নতুন নখ এখনও কাটার উপুযুক্ত হয়নি। হাতে হ্যান্ডকাপ দিয়ে বেঁধে পায়ের বুড়ো আঙ্গলের ছোঁয়া একটু মেঝেতে রেখে সিলিংয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সারারাত। সাবির এখানে আসার আগে জানত না যে, মানুষকে কতরকম শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্তু যে জন্য এতসব তার কিছুই ও জানে না। ওর শালাকেও কি এরকম করা হয়েছে। ওর সাথে দেখা করতে সাবিরের খুব ইচ্ছে করছে। দেখা হলে জিজ্ঞাসা করত, কেন ওর সাথে এ আচরণ করল। প্রায়ই মা, বাবা, ভাই, বোন সাবিরের সাথে দেখা করতে আসে। হামিদা এসেছিল একবার। সে দিন খুব কেঁদেছিল হামিদা। সাবির হামিদার দুই গাল ধরে মাথা তুলে বলেছিল, 'আমি এসবের কিছুই জানি না বউ।'
'মুই জানি তোমার কোন দোষ নাই।'

আদালত ঘড়িতে বেলা বারোটা। চারপাশে পিনপতন নীরবতা। সাবির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। এখন জজ সাহেব রায় পড়ে শুনাবেন। জজ সাহেব রায় পড়া শুরু করলেন, 'কখনও কখনও অপরাধের বিষয়বস্তু ও মাত্র বিবেচনা করতে হয়। অপরাধের মাত্রার যোগফল বেশি হলে শাস্তি বড় হওয়াটা অভিসম্ভাবী। ঠিক তেমনি সাবিরুল ইসলাম বেশ বড় ধরনে অপরাধ করেছেন। তার কাছে শুধু দশ কেজি হিরোইনই পাওয়া যায়নি তিনি মাদক রাজ্যে বিশাল অপরাধি যা এ আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। আর দশ কেজি হিরোইনের মামলা কোন অংশেই ছোট বিষয় নয়। তদন্তের সময় সাবিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় পুলিশ আরো কয়েকটি মামলা দায়ের করে। সেসব অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয়েছে। তাই সাবিরুল ইসলামকে ... আইনে দোষী সাব্যস্ত করে বাংলাদেশ দন্ড বিধির... ধারা মোতাবেক এই আদালত তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার আদেশ দিচ্ছে।' জজ সাহেবের রায় পড়া শেষ হওয়ার আগেই সাবিরুল কাঠগড়ায় ঢলে পড়ল।

রাতের দ্বি প্রহর। ০৫ ফাল্গুন, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ। কুমিল্লা।